মেকলের সম্প্রদায়

॥ বাঙলার নবজাগরণ ও উত্তরকাল ॥

সুহাস মজুমদার
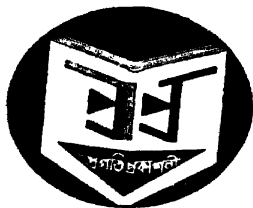
প্রগতি প্রকাশনী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার
প্রগতি প্রকাশনী
২০৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম-প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শ্রীরণজিৎ ভট্টাচা

মুদ্রাকর :
পি. বি. রায়
মাতৃ মুদ্রণ
৮৫/১ এফ্, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীসুধীশকুমার মজুমদার

জ্যেষ্ঠাগ্রজকরকমলেষু

স্বীকৃতি

এ-বইএর প্রকাশকার্যে কয়েকটি মানুষের কাছে আমার ঋণ খুব গুরুতর। প্রকাশক শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটি ছাপিয়ে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রবন্ধবিমুখ বাঙালী পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধের বই নিয়ে উপস্থিত হওয়া দুঃসাহসের কাজ। বিশ্বনাথবাবু যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তার উপযুক্ত প্রশংসা করা আমার অসাধ্য।

বন্ধুবর মানস ভট্টাচার্যের কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম। তার নিষ্কাম বন্ধুপ্রীতির সঙ্গে অক্লান্ত উদ্যমের সংযোগ না ঘটলে এ-বই কোনোদিন প্রকাশকের নজরে আসত কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভব, লেখকের আলমারিতেই এটা কৈবল্যলাভ করত।

বন্ধুবর রণজিৎ ভট্টাচার্য এবং রাখাল নাথের কাছেও আমি ঋণী। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে, কাগজে-কলমে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ বাগাড়ম্বরের মতো শোনাবে, কাজেই তাদের নাম উল্লেখ করেই আমাকে ক্ষান্ত হতে হল।

বইটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল থেকে গেছে। ১০ পৃষ্ঠার ৩ ছত্রে 'বর্থনা' হবে 'বর্ণনা', ৭৯ পৃষ্ঠার ১০ ছত্রে 'সাংস্কৃতিহীন' হবে 'সংস্কৃতিহীন'। ৮২ পৃষ্ঠার ১ ছত্রে 'লিখেছিলেন' হবে 'লিখছিলেন', ১৩৮ পৃষ্ঠার ১০ ছত্রে 'অভুতপূর্ব' হবে 'অভূতপূর্ব' ১৫৫ পৃষ্ঠার ৬ ছত্রে 'অধচ' হবে 'অথচ'।

—লেখক

সূচীপত্র

ভূমিকা

শিক্ষায় সমাজে সভ্যতায় ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় যে নবজীবন এসেছিল, তার পতনের একটা বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য। 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' বা বাঙলার ঐ নবজীবন সম্বন্ধে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু তার পতনের কাহিনী আদৌ সুপরিচিত নয়। এ-বই সেই কাহিনী লেখবার একটা প্রাথমিক প্রয়াস, কাজেই অনেক দোষত্রুটিও এতে টের পাওয়া যাবে। এতে বিশেষ করে সামাজিক ভাবধারার পতনের ইতিহাসকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—'সামাজিক ভাবধারা' বলতে এখানে শিক্ষা, ধর্ম ও সভ্যতাঘটিত ভাবধারাও বুঝতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনার পরম্পরায় আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছি, তার বিবরণ এতে স্থান পায়নি।

তবে এই ত্রুটির সমর্থনেও কিছু বলার আছে। প্রত্যেকেই জানেন, ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর এখনকার সামাজিক ভাবধারা হচ্ছে কমিউনিজ্‌ম্‌, সেকিউলারিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি ধর্মহীন মতবাদ। কিন্তু এও প্রত্যেকেই জানেন, এই সমস্ত মতবাদ আমাদের শিক্ষায় সভ্যতায় কোনো নবজীবন আনতে পারেনি। কেন পারেনি তার কারণ অনেক, কিন্তু একটা কারণ ঐতিহাসিক। আমাদের নূতনতর সামাজিক ভাবধারা আজো পূর্বযুগের ভাবধারার পক্ষপুট থেকে মুক্ত হতে পারেনি, —প্রতিপদে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্বসূরির নামে শপথ না করে সে চলতে পারে না। এর দ্বারা একদিকে পূর্বতন ভাবধারার ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে, অথচ (অন্যদিকে) নূতন ভাবধারাও স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করতে পারছে না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একজন সাম্প্রতিক লেখক লিখেছেন, তিনি প্রচলিত অর্থে পরহিতব্রতী ও শাস্ত্রবাদী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন 'সায়েন্টিফিক হিউম্যানিস্ট'। এই লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। ইনি বিদ্যাসাগরের গৌরবান্বিত নামের সাহায্যে কমিউনিস্ট

জীবনদর্শনকে জনপ্রিয় করতে চান। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা কথা ইনি ভুলে গেছেন। বিদ্যাসাগর আজীবন অসহায় লোকের শরণদাতা ছিলেন। আজ যদি তাঁকে কতকগুলি আধুনিক ইজ্‌ম্‌-এর শরণদাতা সাজতে হয় এবং সেই সমস্ত ইজ্‌ম্‌-এ পাঠ নেবার জন্য যেতে হয় তারই কাছে, তবে তেমন আধুনিকতার গৌরব কী ?

ভাবধারার এই যে বিশৃঙ্খলা—আমাদের সাম্প্রতিক অধঃপতনের অন্ততঃ একটা বড় কারণ এই। কেউ যদি মনে করে, সে গতকাল যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, আজো ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ কার্যতঃ সে যদি ইতিমধ্যে একটা বিপরীত পথে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তবে যে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়, আমাদের এই ভাবধারার বিশৃঙ্খলাও ঠিক সেই স্তরের। ১৯শ শতাব্দীর ভাবধারাকে আমরা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, পূর্ণতররূপে, অভিব্যক্ত করবার চেষ্টা করিনি,—কার্যতঃ তাকে বর্জন করেছি,—অথচ মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করছি বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্বসূরিই আমাদের পথ দেখাচ্ছেন*। এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে ১৯শ শতাব্দীর সামাজিক ভাবধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে হয় এবং তলিয়ে দেখতে হয় কমিউনিজ্‌ম্‌, সেকিউলারিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি মতবাদ কতদূর পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একটা বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে, এবং কতদূর এসেছে ফ্যাশানের তাগিদে। সম্ভবতঃ রাজনীতি-অর্থনীতিতে এরা একটা বাস্তব প্রয়োজনই সিদ্ধ করছে,—আমি সে আলোচনায় যাইনি। কিন্তু শিক্ষায়-সভ্যতায় এদের যে ব্যর্থতা দেখা যায় তার প্রতিকারের একটা প্রাথমিক সোপান হচ্ছে দুই যুগের ভাবধারার পৃথক্‌করণ। অবশ্য সেটাই সব নয়। পরবর্তী সোপান হচ্ছে: পূর্বতন ভাবধারার সময়োচিত পুনর্বিন্যাস, —অথবা সে-ভাবধারা যদি একেবারেই অচল হয়ে গিয়ে থাকে (আমার বিশ্বাস, হয়নি)—তবে নূতন ভাবধারার স্বাধীন পদক্ষেপ। কিন্তু যে দিক দিয়েই দেখা

* আমি উগ্রপন্থীদের কথা বলছি না। তারা বিদ্যাসাগরকেও বলে, "সাম্রাজ্যবাদের দালাল।"

যাক্, ঐ পৃথক্‌করণের কাজটুকু আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। এইজন্যই এ-বইএ বিশেষ করে ভাবধারার সমালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে—ঘটনার বিবরণ পায়নি।

কিন্তু এই পৃথক্‌করণটুকুই এ-বইএর সব নয়। আমাদের নূতনতর সামাজিক ভাবধারার,—কমিউনিজ্‌ম্, সেকিউলারিজ্‌ম্ প্রভৃতি ধর্মহীন মতবাদের—স্বাধীন সমালোচনাও এর অন্যতর উদ্দেশ্য। ১৯শ শতাব্দী-ঘটিত ঐতিহাসিক আলোচনার সঙ্গে ঐ স্বাধীন সমালোচনার সম্পর্ক বোঝাতে হলে প্রবন্ধগুলির ক্রম সম্বন্ধে একটু আভাস দিতে হয়। ভূমিকা আর উপক্রমণিকা বাদ দিলে এ-বইএর তিনখণ্ডে মোট এগারোটি প্রবন্ধ আছে। প্রথম খণ্ডে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ভাবধারাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঐ ভাবধারাকে তিনটি সূত্রের আকারে বিন্যস্ত করা যায়। উপক্রমণিকায় ঐ সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হয়েছে ঐ সূত্রগুলি সম্বন্ধে এযুগের ভুলভ্রান্তি কত বেশি।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম: পরিবর্তন যুগ (১৯০১—'৪৭)। তিনজন মনীষী ব্যক্তির ধ্যানধারণার সমালোচনা করে দেখানো হয়েছে, বেঙ্গল রেনেসাঁসের ভাবধারা এই যুগেই বাঙালা মন থেকে আস্তে আস্তে স্খলিত হয়ে যাচ্ছিল।

তৃতীয় খণ্ডের নাম: আজকের কথা (১৯৪৭—)। এই খণ্ডে দেখানো হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে বাঙালা মন আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট ও সেকিউলারিস্ট ভাবধারার বশীভূত হয়ে পড়ছে—সে ভাবধারা 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' ভাবধারার বিপরীত। আমাদের সাম্প্রতিক অধঃপতনের সঙ্গে এই নূতন ভাবধারার সম্পর্ক দেখানোই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। এ খণ্ডে ঐতিহাসিক আলোচনার উপর জোর দেওয়া হয়নি—যুক্তিতর্কমূলক সমালোচনার সাহায্যে দেখানো হয়েছে: কমিউনিজ্‌ম্-সেকিউলারিজ্‌ম্-এর ভাবধারা যদি ১৯শ শতাব্দীর ভাবধারার সঙ্গে মিশ্রিত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করত, তাতেও অবনতির সম্ভাবনা কমত না, এবং বর্তমান ভারতে তেমন অবনতির লক্ষণও প্রচুর। শেষ প্রবন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—সেই অবনতিরোধের পথ কী।

আমার এমন বিশ্বাস নেই যে, এ-বইএ আমি যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছি সেগুলি সবাই মেনে নেবেন। কোনো যুগে যে ভাবধারা কোনো দেশের সমগ্র শিক্ষিতসমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, সমসাময়িক লোকের কাছে তার বিরূপ সমালোচনা কখনোই রুচিকর হয় না। আধুনিক বাঙলার কমিউনিজ্‌ম্‌, সেকিউ-লারিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি মতবাদ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু যাঁরা এই সমস্ত মতবাদের বিরূপ সমালোচনায় বিরক্তি বোধ করবেন, তাঁরা যেন একটা কথা ভেবে দেখেন। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, ধর্মজাগরণের প্রয়াস ছাড়া শিক্ষায়-সভ্যতায় আমরা কোনো উন্নতির পথ দেখতে পাব না, কিন্তু এ বিশ্বাস আমি আমার পাঠকদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করিনি। আমি কেবল যুক্তিতর্ক ও তথ্যপ্রমাণ-সহযোগে ধর্মহীন ভাবধারার নিষ্ফলতার দিকটা প্রকট করতে চেয়েছি। আমি কেবল দেখাতে চেয়েছি: আমাদের বর্তমান অবস্থা এমন নয় যে, যে-কোনোরকম বহুজনমান্য, এমনকি সর্বজনমান্য ভাবধারা নিয়েও আমরা তৃপ্ত থাকতে পারি। শিক্ষায়-সমাজে-সভ্যতায় আমাদের চরম অধঃপতন হয়েছে। যাঁরা এই অধঃপতন দেখেও দেখেন না তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা চোখ থাকতেও এ অধঃপতনকে চোখ ঠেরে থাকেন, তারা কেবল রাত্র্যন্ধ নন, তাঁরা দিনরাত্রি সকল সময়েই চরম মানসিক অন্ধতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই অন্ধতার নিবারণ হওয়া উচিত। যত জনের মান্যই হোক, যে-কোনো ভাবধারাকেই আজ আমাদের বিচার-বিতর্কের তীব্রোজ্জ্বল আলো দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত। "আমরা বুদ্ধিজীবী, অতএব বহুজনমান্য ভাবধারার চর্বিত-চর্বণ করাই আমাদের কাজ"—এমনধারা মনোভাবের অবসান হওয়া উচিত। অলমতিবিস্তরেণ।

কলিকাতা,

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

—লেখক

উপক্রমণিকা

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ও বিংশ শতাব্দীর ভারত ॥

বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসের একটা গৌরবের যুগ। সম্ভবতঃ এক চৈতন্যের যুগকে বাদ দিলে এ রাজ্যে এর চেয়ে গৌরবের যুগ আর আসেনি। ঐতিহাসিকরা একবাক্যে এটাকে বাঙলার 'নবজাগরণের যুগ' বলে থাকেন,—অনেকে ইতালীর রেনেসাঁসের অনুকরণ করে বলেন 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'। মোটামুটি ১৮০০ সাল* থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই রেনেসাঁসের স্থায়িত্বকাল ধরলে ভুল হয় না। ১৯১১ সালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে,—সে দুটির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ঐ মুহূর্তে কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। ১৯০৫ সালের কার্জনী বঙ্গভঙ্গ ঐ বৎসর রদ হয় এবং সেই সঙ্গে লোপ পায় কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্ব। এতদিন পরে আমরা বুঝতে পারি : যে মুহূর্তে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল, সে মুহূর্তে বাঙলার জাগরণের হৃৎপিণ্ডও স্তব্ধ হতে শুরু করল। বাঙালীরা এতকাল চিন্তারাজ্যে সারা ভারতে প্রধান ছিলেন, এখন থেকে সে প্রাধান্য বিচলিত হল। রাজনীতির নেতৃত্ব বলুন, মনের নেতৃত্ব বলুন, ধনের নেতৃত্ব বলুন, এখন থেকে সব কিছুই গেল অপরের হাতে। আরেকটু ভাবলে বোঝা যায়; সেদিনকার বঙ্গভঙ্গের অবসান নিয়েও উল্লাসের কারণ ছিল না।—তার কারণ, ১৯১১ সালে যদি কার্জনী বঙ্গভঙ্গের আইন বাতিল না হত, তাহলে ১৯৪৭ সালের বঙ্গভঙ্গের পরিণতি হয়তো বাঙালীর পক্ষে এত মারাত্মক হত না, বাঙালীর অবনতি হয়তো আজকের মতো সর্বাঙ্গীণ হত না।

সে যাই হোক, ১৯৪৭ সালের আগে আমাদের এই সর্বাঙ্গীণ সর্বনাশের মূর্তি

* ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হয়। বাঙলা গদ্যের উৎপত্তির দিক থেকে ঐ কলেজের প্রতিষ্ঠাকে 'বেঙ্গল রেনেসাঁসে'র সূচনা ধরলে অন্যায় হয় না।

লোকচক্ষুর গোচরে আসেনি, কিন্তু সর্বনাশের সূচনা যে আগেই হয়েছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। অন্ততঃ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে অবনতির ছাপ পড়েছিল স্বদেশী যুগেই ; শিক্ষিত বাঙালীর মনে এ তিনটির স্থান নিয়েছিল রাজনীতি। এই তিন ক্ষেত্রে এখন যে অবস্থা হয়েছে তার কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। শিক্ষালয়ে আজ ভূতপ্রেতের তাণ্ডবনৃত্য ; সমাজ আজ ছিন্নভিন্ন ; ধর্ম আজ জীবনের সাধনা না হয়ে বারোয়ারি দেবতার বিসর্জনের-মিছিল-বের-করা মণ্ডপ যুবসংঘের ঢাক-ঢোল-বাজানো, মুখ-দিয়ে-কেরোসিনের-আগুন-ফুঁকানো, কর্ণ-বিদারী-শব্দবোমা-ফাটানো বপ্রক্রীড়ায় পর্যবসিত। যে-কোনো দেশের মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার মূল হচ্ছে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম—অথচ এই তিন ক্ষেত্রেই আজ আমাদের এই দশা। তবে আজকের অবনতি শুধু বাঙালীর একার নয়—গোটা ভারতবর্ষই এ অবনতির অংশীদার। শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মে,—এবং তারই ফলস্বরূপ মনুষ্যত্বে ও সভ্যতায়—ভারতবাসীর আজকের অবনতির তুলনা নেই।

এই যে অবস্থা, এর বিভীষিকা আজ প্রায় প্রত্যেকটি লোকেরই গোচরে এসেছে। কিন্তু এই চরম সঙ্কটে পৌঁছনোর পরেও একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন আমাদের মধ্যে সচরাচর শোনা যায় না। খুব কম লোককেই জিজ্ঞাসা করতে শোনা যায় : ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে এমন কোন্ বড় ভাব বা বড় চিন্তা এসেছিল, যা আমরা স্বদেশী আন্দোলনেব পর থেকেই হারিয়ে ফেলেছি ? এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে দেখা যায় ভারত জুড়ে আজ একটি মন্ত্রেরই আরাধনা হয়—সেটা হচ্ছে, 'আধুনিকতা' বা 'প্রগতি'র মন্ত্র। এই মন্ত্রের সঙ্গে ১৯শ শতাব্দীব বাঙালীদের স্বীকৃত ভাবধারার সম্বন্ধ কী, সে জিনিসটা আজ পর্যন্ত কেউ বিশদভাবে আলোচনা করেননি। অনেকে এমনও ধারণা পোষণ করেন যে, 'আধুনিকতা'র পিছনেও ১৯শ শতাব্দীর প্রেরণাই ক্রিয়া করছে। এই ভুল ধারণার মূলোচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থাবদলের কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই বাঙলার নবজাগরণ শিক্ষা, সমাজ

ও ধর্মের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ভাবের ফল, স্বদেশী আন্দোলনের পরে কোন্ কোন্ ভাবের অবসান হল, এ প্রশ্নের গুরুত্ব খুবই বেশি।

১৯শ শতাব্দীর ভাবধারা

আশ্চর্যের বিষয়, 'আধুনিকতা' ও 'প্রগতিবাদের' কল্যাণে এ-প্রশ্নের উত্তরেও কতকগুলি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বাঙলার জাগরণ সেদিনকার ঘটনা, কিন্তু আমাদের এই ইতিহাসবিমুখ দেশে সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধেও সত্যনির্ধারণের পথ কণ্টকাবৃত। কেউ বলেন, Humanism* বা 'মানবতাবাদ'ই বাঙলার জাগরণের মূল, কেউ যুক্তিবাদ বা Rationalismকে সেই গৌরবজনক ভূমিকার অধিকারী করতে চান; কেউ আবার বলেন, 'লিবার্টি' বা ব্যক্তিস্বাধীনতার মন্ত্রই সে-যুগের মূল কথা। এসব কথা যে অত্যন্ত ভ্রান্ত বা একপেশে, এক 'মানবতাবাদে'র মতটাকে একটু ভালভাবে পরীক্ষা করলেই সেটা বোঝা যায়। যাঁরা বলেন, বাঙলার জাগরণযুগ 'মানবতাবাদের' যুগ তাঁদের মনের ভাব এই যে, সে-যুগে শাস্ত্র ও ধর্মকে বাতিল করে দিয়ে ধর্মহীন ঐহিকতা বা ধর্মহীন মানব-জীবনের মাহাত্ম্য প্রচার করা হত। কিন্তু এ-কথার সপক্ষে প্রমাণ অতি সামান্য। বাঙলার জাগরণযুগ বিশেষভাবে ধর্মজিজ্ঞাসার যুগ: এমন-কি হিন্দুর ধর্ম বা হিন্দুর শাস্ত্রকে যাঁরা বাতিল করতে চেয়েছিলেন তাঁদেরও ভাবনা-চিন্তার মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম (যথা ডিরোজিওশিষ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়)। ধর্মহীন সমাজ গড়ার প্রস্তাবটা নিতান্তই এ-যুগের দান—'আধুনিকতা' বা 'প্রগতিবাদের' দান। ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ মূলতঃ ধর্মজাগরণ —'আধুনিকতা' বা 'প্রগতিবাদ' তার বিপরীত।

যদি আমরা সে-যুগের উপর এ-যুগের ভাবধারা না চাপাই, যদি আমরা অতীতকে অতীতের আলো দিয়েই বোঝবার চেষ্টা করি, তাহলে এই একপেশে

* Humanism শব্দের অন্য অর্থ আছে, সে অর্থে হিউম্যানিজমকে বাঙলার জাগরণের মূল বলা যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ধারণাগুলির কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন দেখা যায়, ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ইতিহাস আসলে তিনটি আশ্চর্য-শক্তিশালী ভাবের ইতিহাস,—এমন সব ভাবের ইতিহাস যেগুলির ভিতর মানবতাও ছিল, যুক্তিও ছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতাও ছিল, কিন্তু মানবতা'বাদ' ছিল না, যুক্তি'বাদ' ছিল না, ব্যক্তিস্বাধীনতা'বাদ' ছিল না। ১৯শ শতাব্দীর ভাবগুলো হচ্ছেঃ (১) একদিকে ষষ্ঠী-মনসা ও জাতপাতের ধর্ম সম্বন্ধে একান্ত অনাস্থা, আরেকদিকে গীতা-উপনিষদের ধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রিত নূতন এক মানবসেবাধর্মের প্রতি একান্ত আগ্রহ। (২) সমাজের প্রাচীন ধারাটিকে বজায় রেখে সমাজের সংস্কার করবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। (৩) ইংরেজিভাষাকে গ্রীকোরোমক ও খ্রীষ্টান ইউরোপীয় সভ্যতার বাহনরূপে দেখে এবং সংস্কৃতমূলক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে সেই ইউরোপীয় সভ্যতার সহোদরসভ্যতারূপে দেখে ঐ দুই ভাষা এবং ঐ দুই সভ্যতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।* সে-যুগের 'যুক্তিবাদ' বা 'মানবতাবাদ' এই তিনটি ভাবের সহায়করূপেই কাজ করেছিল,—যাঁরা এগুলোকে স্বতন্ত্র 'ইজ্‌ম্'-এর স্থান দিতে চান সে-যুগের ইতিহাসে তাঁদের মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের কাল থেকে বিবেকানন্দের কাল পর্যন্ত এই তিনটি ভাবই বাঙালী মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। এই তিনটি ভাবের জোরেই ব্রাহ্মসমাজ ও 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের' দলাদলি ও মতবিরোধ সেই জাগ্রত মনের উদ্দীপনাকে খর্ব করতে পারেনি। যেদিন থেকে এই তিনটি ভাব ক্ষীণ হতে লাগল, যেদিন থেকে ইংরেজিশিক্ষার মতো মানুষ গড়ার শিক্ষাও কতকগুলি কেতাবী বিদ্যার উপকরণশিক্ষায় পর্যবসিত হল, যেদিন থেকে ধর্মজাগরণের প্রতি বিমুখ হয়ে রাজনীতি ও 'আধুনিকতাকেই' আমরা বরণ করে নিলাম—সেদিন থেকেই শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মে ভারতজোড়া অবনতির সূচনা

* সংক্ষেপে এই তিনটি সূত্রকে বলা যায়ঃ (১) আস্তিকতার সহযোগী মানবসেবা, (২) সমাজধারা রক্ষার সহযোগী সমাজ সংস্কার, (৩) সংস্কৃতচর্চার সহযোগী ইংরেজিচর্চা।

হল। বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই যার শুরু, বর্তমান বাঙালী জীবনের সর্বাঙ্গীণ অবনতি সেই আদি ঘটনারই পরম্পরাগত ফল মাত্র।

বিংশ শতাব্দীর ভাবধারা—ফিরিঙ্গি সভ্যতা

ফল যারই হোক, ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় ধর্মজাগরণের যে স্থান, আজকের বাঙলায় 'আধুনিকতার' ঠিক সেই স্থান। আগেই ইঙ্গিত করেছি, আধুনিকতার সবচেয়ে বড় ভাব হচ্ছে ধর্মহীন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতা—লিবার্টি ও হিউম্যানিজ্‌ম্‌। আজকের বাঙলায় এগুলি শুধু ধর্মবিমুখ নয়, -ধর্মবিদ্বেষী আকারেই প্রচারিত হয় এবং সে অর্থে এগুলি বাঙলার জাগরণের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাব। কিন্তু লিবার্টি ও হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর উচ্চ আদর্শকে একান্ত করে দেখলে আধুনিকতার মূলীভূত ক্ষুদ্রতার দিকটা চট্ করে আমাদের নজরে পড়ে না। তার জন্য তাকাতে হয় আধুনিকতার যেটা সর্বনিম্ন স্তর তারই দিকে। দেশ জুড়ে আজ এই যে আধুনিকতার জয়ঢাক বাজছে তার সপক্ষে অনেক অনেক যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু আজকের ভারতের মনুষ্যত্ব ও সভ্যতা-ঘটিত অবনতির স্রোতে যা বানের জলের কাজ করছে সেটা হচ্ছে, বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকতার যুক্তিতে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি সমাদরের যুক্তিতে দেশ জুড়ে একধরনের ফিরিঙ্গিআনার প্রচার, সেইটেই আধুনিকতার সর্বনিম্ন স্তর। বিজ্ঞান আধুনিকতার একটা বড় স্লোগান, কিন্তু আমাদের দেশের মদ ও গোমাংসঘটিত প্রাচীন সংস্কারগুলির অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে কোলাহল করাও এই আধুনিকতারই শিক্ষা। এই দুই শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টি আজকের ভারতে বেশি শক্তিশালী সে-কথা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার বৈজ্ঞানিক এ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে শুঁড়িখানার বৈজ্ঞানিক এ্যাড্‌ভেঞ্চারেই আজকের ভারতের তৎপরতা অনেক বেশি। পাশ্চাত্ত্যসমাজের সর্বস্তরব্যাপ্ত এবং সর্বশ্রেণীগত বাহ্য সম্পদের মহিমাও আধুনিকতার আরেকটা স্লোগান,—আমরা তা নিয়ে মাঠে-ময়দানে বক্তৃতাও করি। কিন্তু আমরা 'পূজা' করি কোন্

বাহ্য সম্পদের ? পূজা করি এক নূতনতর জাত্যভিমানসূচক কতিপয় 'স্টেটাস সিম্বলে'র,—কতকগুলি অতিতুচ্ছ 'গ্যাজেটে'র—রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ফ্রিজিডেয়ারের—মহিলাদের ক্ষেত্রে, মাথাপিছু-কমপক্ষে-পঞ্চাশখানা শাড়ি-বোঝাই বাক্স-তোরঙ্গের। শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে আজ এইরকম আধুনিকতার ঘটস্থাপনা হয়েছে। 'আধুনিকতা' ও 'প্রগতির' যদি আর কোনো দোষ নাও থাকত, তবু কেবল এরই জন্য এরা ঘৃণার যোগ্য হত।

একথা মানতেই হবে, এই 'ফিরিঙ্গি-সভ্যতার' পূজা আমাদের দেশে ১৯শ শতাব্দীতেই এসেছিল। কিন্তু 'বাঙলার জাগরণের' একটা বড় জিনিস এই যে, সে-যুগের ইংরেজিশিক্ষিতেরা একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্যের গ্রীকো-রোমক ও গ্রীস্টান সভ্যতার আদর্শ দিয়ে আমাদের জাতীয় অসভ্যতার প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট ছিলেন, আরেকদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ দিয়ে 'ফিরিঙ্গি সভ্যতা'র নিরাকরণে যত্নবান ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যাঁরা শেক্‌সপীয়র-মিল্টনের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, তাঁরাই 'মদ্যপান নিবারণী সমিতি' গড়েছিলেন। যাঁরা বিধবার বিয়ে দিতে উদ্যোগী ছিলেন তাঁরাই আবার মনু-পরাশরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মনু-পরাশর প্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সঙ্গত মনে হয়নি —আজকের দিনে বোধ হয় কারো কাছেই হবে না। কিন্তু বিধবাবিবাহ যাতে একটা 'ফিরিঙ্গি' কেচ্ছায় পর্যবসিত না হয়, বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর দুজনের কাছেই এটা ছিল খুব বড় প্রশ্ন,—আগেই বলেছি 'সমাজের ধারা রক্ষা করে সমাজের সংস্কার' সে-যুগের ইংরেজিশিক্ষিতদের একটা মূল ভাব। আজকের ইংরেজিশিক্ষিতদের —যাঁদের আমি 'মেকলের সম্প্রদায়' নাম দিয়েছি সেই শিক্ষিতদের—মূলভাব হচ্ছে জাতীয় সমাজধারার প্রতি দারুণ প্রতিকূলতা। এই প্রতিকূলতা আজ সাহিত্যকেও আচ্ছন্ন করেছে, রাজনীতিকেও আচ্ছন্ন করেছে, বিজ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করেছে। তারই ফলে আমরা আজ ভারত জুড়ে পূর্বোক্ত আশ্চর্য ঘটনার প্রসার দেখতে পাচ্ছি : বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা আজ আমাদের মধ্যে বড় দরের বৈজ্ঞানিকের জন্ম দিচ্ছে না, জন্ম দিচ্ছে বড় দরের মন্ত্রপের, চাঁদে যাবার পোশাক তৈরি করবার

মতো দর্জির জন্ম দিচ্ছে না, জন্ম দিচ্ছে কতকগুলি জন্মনিয়ন্ত্রণের যন্ত্রশিল্পীর। এই-টেকেই আমি ফিরিঙ্গি সভ্যতা বলছি, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে এটাকে গুলিয়ে ফেলা যায় না।

বিংশ শতাব্দীর ভাবধারা—জড়বাদ ও ব্যক্তিগত ধর্ম-বাদ

কিন্তু এও শেষ পর্যন্ত সামান্য ব্যাপার। এই ফিরিঙ্গি সভ্যতার প্রসারই যদি 'আধুনিকতার' একমাত্র দান হত তবে তাকে একটা সাময়িক উপদ্রব ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু দেশগঠনের ভাবধারায়, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে এবং সাধারণভাবে সভ্যজীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই আজ আমরা বাঙলার 'রেনেসাঁসে'র ভাবধারা থেকে দূরে সরে এসেছি, প্রত্যেকটি স্তরেই আমরা ধর্মবিমুখ বা ধর্মবিদ্বেষী হয়ে পড়েছি। একদিকে আধুনিক চীন-রাশিয়ার জড়বাদ ও প্রাচীন-সমাজ-ধ্বংসের মতবাদ, আরেক দিকে খ্রীষ্টান-ধারা-বিচ্যুত ইউরোপ-আমেরিকার যার-যেমন-খুশি-তেমন-ধর্ম-বাদ এবং সমাজধারানাশী 'লিবার্টি' বা ব্যক্তিস্বাধীনতার মতবাদ আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। ফিরিঙ্গি সভ্যতাকে যদি আধুনিকতার সর্বনিম্ন স্তর বলি, তবে এগুলো হচ্ছে তার সর্বোচ্চ স্তর। জড়বাদীরা বলে: ধর্মকর্মের কোনো দরকার নেই—আমাদের প্রাচীন আস্তিক সমাজকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তারা একটা নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক ও সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে চায়। অন্যদল বলে, ধর্ম জিনিসটা 'ব্যক্তিগত'—ভালো সমাজে 'সামাজিক ধর্মের' কোনো স্থান নেই*। তাদের মতে ভালো সমাজ গড়তে হলে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিমাণ এমন করে বাড়াতে হয় যাতে করে প্রত্যেকে তার জন্মপ্রাপ্ত আলোটুকু দিয়েই নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। এসব কথা শুনতে অত্যন্ত সুমধুর;—বাজ পড়ার আগের মুহূর্তে বিদ্যুতের আলো যেমন

১। জড়বাদী ও 'ব্যক্তিগত ধর্মবাদী'কে যথাক্রমে কমিউনিষ্ট ও সেকিউলারিষ্ট নাম দেওয়া যায়। এঁরাই আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতের প্রতিনিধি।

সুমধুর—এ-সব কথা তারই মতো সুমধুর। শিক্ষিত ভারত এই বিদ্যুতের আলো দেখেই মুগ্ধ হয়েছে, অত্যাসন্ন বজ্রপাত সম্বন্ধে তার কোনো চৈতন্য নেই। কিছুমাত্র বিচার-আচার না করেই সে জড়বাদী চীন-রাশিয়া এবং খ্রীস্টানধারাবিচ্যুত ইউরোপ-আমেরিকার দার্শনিক মতগুলি শিরোধার্য করে নিয়েছে,—এগুলোই তার কাছে জীবনযাপনের 'ক্রীড্', 'ফেইথ' (Faith) বা 'আইডিওলজি'।

এই ক্রীডের বিস্তারিত সমালোচনা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। এখানে আমি সংক্ষেপে একটা কথা বলব : এই ক্রীডের দ্বারা চীন-রাশিয়া বা ইউরোপ-আমেরিকার মতো সমৃদ্ধি ও শক্তিলাভ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনিশ্চিত—কিন্তু মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার অবনতি সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। সমৃদ্ধি ও শক্তি অনিশ্চিত এইজন্য যে তার জন্য খানিকটা কর্মদক্ষতাও দরকার করে,—কেবলমাত্র 'আধুনিকতার' ক্রীড্‌কে জপমালা করে আজ পর্যন্ত কেউই সমৃদ্ধি ও শক্তিলাভ করতে পারেনি। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার অবনতি কেবল জপমালার দ্বারাই হতে পারে—আমাদের মধ্যে তার বহু লক্ষণ আজ প্রকট। তাছাড়া শুধু তো আমাদের দেশে নয়, জগতের প্রত্যেকটি দেশেই এই ক্রীডের ফল হচ্ছে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার অবনতি,—এমন অবনতি যার কাছে মদ-মাংসের ফিরিঙ্গিআনাও অতি তুচ্ছ। আমাদের দেশে এই ক্রীডের ধর্মকর্ম-ধ্বংসী ফিরিঙ্গিআনার দিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকা ও চীন-রাশিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে আরেকটা দিক। প্রকাশ পাচ্ছে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের দিক—যে রাষ্ট্রের চাপে মানুষ গুঁড়ো হয়ে যায়। প্রকাশ পাচ্ছে নিষ্ঠুরতার দিক,—যে নিষ্ঠুরতা কল্যাণচিন্তাহীন নাস্তিক্যবাদী মানুষের যথার্থ স্বরূপ। নাৎসীদের ইহুদী-হত্যা, কমিউনিস্টদের কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প, আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের হাতে কৃষ্ণাঙ্গদের নিপীড়ন—এগুলোর কোনোটাকেই নাস্তিক্যবাদ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। আরো প্রকাশ পাচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতার দিক, জীবনভোর একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতার দিক—যার ফল হচ্ছে জগৎজুড়ে আজ 'হিপি', 'মাস্তান' প্রভৃতি যুবসংঘের সৃষ্টি। আমাদের দেশেও যে এসব ফল দেখা যায়নি

সে-কথা কোনোমতেই বলা যায় না। তা ছাড়া একথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভারতের মানুষ আর ধার্মিক মানুষ হচ্ছে না, হচ্ছে 'কাগজী' বা 'দলীয়' মানুষ, খতম-কর-নিপাত-যাক-ওয়ালা মিছিলের মানুষ,—এ জিনিসটাও পূর্বোক্ত ক্রীডেরই পরিণতি। কাজেই আধুনিকতার ক্রীড শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বনাশী ও সভ্যতানাশী—মদমাংসের ফিরিঙ্গিআনা তার কাছে ছেলেখেলা।

কয়েকটি প্রশ্ন

আজ এই দেশজোড়া অবনতির দিনে দুটো গোড়ার কথা আমাদের তলিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। ভেবে দেখবার সময় হয়েছে: আমরা কি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ধারাটিকে জীবন্ত করে তোলবার চেষ্টা করব, না আজকের ইউরোপ-আমেরিকা বা চীন-রাশিয়ার মতো অপরিমিত শক্তিসম্পদ লাভের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে আধুনিক অসভ্যতার জাজ্বল্যমান স্তম্ভগুলিকে দেশের মধ্যে কায়েম করবার চেষ্টাতেই প্রাণপাত করব? যাই কেননা আমরা করি, আমাদের মনে রাখা উচিত, এই দুরকম কাজের মধ্যে প্রথমটার মূল হচ্ছে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার ধর্মজাগরণের ভাবধারা—যে ভাবধারা আজকের শিক্ষিত ভারত থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে বললেই চলে; দ্বিতীয়টার মূল হচ্ছে আধুনিকতার ক্রীড,—যে ক্রীডের কাছে শিক্ষিত ভারত আজ দাসখত লিখে দিয়েছে। আজকের ভারতের শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের কাহিনী, তার মনুষ্যত্ব ও সভ্যতাসাধনার কাহিনী—সমস্তই এই খতলেখা দাসত্বের কলঙ্ককাহিনী মাত্র। যারা জেগে ঘুমোয় তারা ছাড়া আর কারো কাছেই ভবিষ্যতের সংকেত আজ অস্পষ্ট নয়। আজ আমাদের ব্যাকুলভাবে ভেবে দেখবার সময় হয়েছে, ভারতের বসতবাটিগুলি কি এখন থেকে কতকগুলো মদমাংস, বৈজ্ঞানিক গ্যাজেট এবং জন্মনিয়ন্ত্রণযন্ত্রের পণ্যশালায় রূপান্তরিত হতে থাকবে? ভারতের যৌবনশক্তি কি ক্রমেই কো-এডুকেশন কলেজ বা সাংস্কৃতিক জলসায়, সিনেমা হলে বা পিকনিক পার্টিতে, চায়ের দোকানে বা রাস্তার চৌমাথায়, মাস্তান মহাপুরুষদের অশ্রাব্য

ভাষাব্যবহার, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি এবং বিপ্লবিয়ানার কদর্য হুঙ্কারেই নিঃশেষ হতে থাকবে? ভারতের ভদ্রসমাজ কি অতঃপর একপাল ভেড়ার সঙ্গে তুলনীয়, হুজুগ-সর্বস্ব, সিনেমাবৎসল, একান্ত-মস্তিষ্কহীন,'কাগজী' মানুষের সমাজরূপেই অভিব্যক্ত হতে থাকবে? ভারতের আকাশ-বাতাস কি কেবলই হাজার হাজার নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তুলনীয়, খতম-কর-মন্ত্র-দীক্ষিত, 'দলীয়' মানুষের শ্বাপদ-হিংস্রতায় শব্দায়মান হতে থাকবে? ভারত কি শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মে, ভারতের মানুষ কি মনুষ্যত্বে ও সভ্যতায়—পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ থেকেই ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকবে?—এগুলোই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের পরম ভাগ্য এই যে, এ সমস্ত প্রশ্ন কেউ এখন আর ভুলেও উত্থাপন করে না।

—

প্রথম খণ্ড ঃ

বাঙলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁস (১৮০০-১৯১১)

॥ মেকলে • ডিরোজিও • বিদ্যাসাগর ॥

১। মেকলের সম্প্রদায়।

২। ডিরোজিয়ানদের কথা।

৩। বিদ্যাসাগর কি 'আধুনিক' ছিলেন ?

৪। বিদ্যাসাগর প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা

'বেঙ্গল রেনেসাঁসে'র সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি কারা? সম্ভবতঃ অনেকেই বলবেন: রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর বোধ হয় চরিত্রের দিক দিয়ে সকলের চেয়েই বড় ছিলেন, অন্ততঃ কারও চেয়েই তিনি ছোট ছিলেন না। কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁসের প্রতিনিধিরূপে রামমোহন-বঙ্কিমের গুরুত্ব তাঁর চেয়ে বেশি বই কম নয়। তাই যদি হয়, তবে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালী মনের পরিচয় দিতে গিয়ে বিশেষ করে বিদ্যাসাগরকে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত কিনা?

তার চেয়ে বড় প্রশ্ন: 'বেঙ্গল রেনেসাঁসে' মেকলের স্থান কী? আমরা জানি, ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে তাঁর ভূমিকা অনেকখানি, কিন্তু এই ভারতদ্বেষী ইংরেজকে আজ পর্যন্ত তো কেউ বাঙালীর মানসিক জাগরণের প্রতিনিধিরূপে দেখেননি। তাই যদি হয়, তবে ১৯শ (এবং ২০শ) শতাব্দীর বাঙালী মনের পরিচয় দিতে গিয়ে মেকলের নাম করাও যুক্তিযুক্ত কিনা?

ডিরোজিও সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন করা যায়। সবশেষে এই তিনটি প্রশ্নকে একত্র করে একটি অতিসংহত অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উপস্থিত করা যায়: মেকলে-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগরই কি 'বেঙ্গল রেনেসাঁসে'র প্রাণপুরুষ?

এটা যদি কেবল একটা ঐতিহাসিক গবেষণা ঘটিত প্রশ্ন হত তাহলে এ বই-এর শুরুতেই আমি এর উপর জোর দিতাম না। কেননা এ বইএ যদিও ঐতিহাসিক আলোচনা আছে তবু দলিল দস্তাবেজ ঘটিত ইতিহাসের গৌরব এর প্রাপ্য নয়। তা ছাড়া ঐতিহাসিক প্রশ্ন হিসাবে এরকম প্রশ্নের গুরুত্বও সন্দেহস্থল। ইতালীর রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ কে? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি? লরেনৎসো দি ম্যাগ্নিফিসেণ্ট্? পজিও ব্রাচিওলিনি? আরিয়োস্টো? মাকিয়াভেলি? সাভোনারোলা? সীজার বর্জিয়া? এসব প্রশ্ন নিরর্থক, কেননা এঁদের কোনো একজন বা দুজনকে নিয়ে ইতালীর রেনেসাঁস ইতালীর রেনেসাঁস হয়নি।

অতএব আমার প্রশ্নটাও কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়। প্রশ্নটার গুরুত্ব সাময়িক,—এটা একেবারেই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটিত প্রশ্ন। এখনকার বাঙলায় যাঁরা 'বুদ্ধিজীবী' নামে পরিচয় দেন তাঁরা বিশেষ করে ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নিজেদের মনের সাধর্ম্য উপলব্ধি করেন। সম্ভবতঃ মেকলের সঙ্গে তাঁদের সাধর্ম্য আরো বেশি, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁরা সজাগ নন। এই 'বুদ্ধিজীবী' দলকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা যায়—একদল কমিউনিস্ট, আরেক দল সেকিউলারিস্ট। বলা বাহুল্য আমি এখানে রাজনৈতিক কমিউনিজম্ বা রাজনৈতিক সেকিউলারিজ্ম্-এর কথা বলছি না; কিন্তু 'কমিউনিস্ট জীবনদর্শন' এবং 'সেকিউলারিস্ট জীবনদর্শন' নামেও দুটি জিনিস আধুনিক বাঙলায় প্রচলিত হয়েছে। এই দুই জীবনদর্শনই ধর্মবিমুখ বা ধর্মবিদ্বেষী, বিশেষ করে হিন্দু-ধর্মবিদ্বেষী এবং হিন্দুসমাজবিদ্বেষী।—বেঙ্গল রেনেসাঁসের যুগে কি এই জীবনদর্শনের পূর্বাভাস ছিল? বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা বলেন, ছিল—অন্ততঃ ডিরোজিও আর বিদ্যাসাগরে ছিল।

এসব কথা সত্য কিনা তার একবার যাচাই হওয়া দরকার। আরো বেশি যাচাই হওয়া দরকার, সাধারণভাবে ধর্মবিমুখ বা ধর্মবিদ্বেষী এবং বিশেষ ভাবে হিন্দুধর্মবিদ্বেষী এবং হিন্দুসমাজবিদ্বেষী ভাবধারাই বেঙ্গল রেনেসাঁসের প্রাণ কিনা। কেবল ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার নয়, বিংশ শতাব্দীর বাঙলার পক্ষেও এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন আর নেই॥

মেকলের সম্প্রদায়

॥ এক ॥

ভারতের ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীর উপর কার প্রভাব সব চেয়ে বেশি? ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, না টমাস ব্যাবিংটন মেকলের? এই তিনজনকে ১৯শ শতাব্দীর ভারতের (বিশেষ করে বাঙলার) ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণীর দীক্ষাগুরু বলা যায়। কাজেই ২০শ শতাব্দীর ইংরেজিনবীশদের উপরেও এঁদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কার প্রভাব বেশি—এ প্রশ্নের উত্তরে ভারতদ্বেষী মেকলের নামই বিশেষভাবে করতে হয়। ডেভিড হেয়ারের কথা বাঙালী আজো ভোলেনি, কিন্তু মেকলের প্রেতাত্মা যেভাবে আজো তার কাঁধের উপর চেপে বসে আছে, আজকের বাঙালী তার খোঁজ রাখে না। এই অজ্ঞতার নিরসন হওয়া উচিত।

॥ দুই ॥

মেকলের জীবনী পড়ে জানা যায়, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে তাঁর জাহাজ যখন মাদ্রাজের উপকূলে নোঙর করে, তার আগে পর্যন্ত ইংলণ্ডই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক কীর্তিকাহিনী ছিল তাঁর জ্ঞান-গবেষণার বিষয় এবং ইংলণ্ড ও প্রাচীন গ্রীস-রোমের কাব্যকবিতা ছিল তাঁর সাহিত্যচর্চার উপাদান। এর আগে তাঁর জীবনে ভারতের কী স্থান ছিল জানা যায় না। তবে ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে এবং ইংরেজ লেখকদের সমাজে ঐ চৌত্রিশ বছর বয়সেই তিনি কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। হুইগদলের মন্ত্রিসভায় 'বোর্ড অব কণ্ট্রোলের' সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হয়ে ঐ বয়সেই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন; তার সঙ্গে পেয়েছিলেন এডিনবরা রিভিউ-এর একজন উদীয়মান লেখকের খ্যাতি; তার কারণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর যশ তখন থেকেই

ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং যথেষ্ট উচ্চপদ সত্ত্বেও অভাবের কাঁটাখোঁচা তিনি তখনও এড়াতে পারতেন না; কারণ সেক্রেটারী পদের বাঁধাবেতন এবং উদীয়মান লেখকের পাওনা সাম্মানিক দক্ষিণার গুটিকতক টাকা দিয়েই তাঁকে সমস্ত পরিবারের খরচ চালাতে হত। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঐ সময় হুইগদলের একটা ভাগ্য-বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়—টমাস ব্যাবিংটনের ভাগ্যসূত্রটাও তাতে জড়িয়ে যায়। ঠিক এমনি সময়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে, ইচ্ছে করলে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য পদে যোগ দিতে পারেন। প্রস্তাবটা লোভনীয়, মেকলে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে এই সম্মতিদানের কারণ ভারতবিষয়ক কোন আগ্রহ নয়; চিঠিপত্র থেকে জানা যায় জীবিকার কথা ভেবেই তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হন। একথা ঠিক, লেখক হিসাবে এর মধ্যেই তাঁর যেটুকু নাম হয়েছিল তার জোরে তিনি ইংলণ্ডে থেকেই কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করতে পারতেন। কিন্তু সেরকম দিনপাতে মেকলের আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া প্রতিভার মতো অমূল্য জিনিসকে তিনি উপার্জনের জাঁতাকলে ফেলে রূপো ঢালাই করতে চাননি। ঐ সময়ের একটা চিঠিতে তিনি তাঁব স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কারের সুরে লিখেছিলেন:

"এতদিন পর্যন্ত সাহিত্য ছিল আমার অবসর-বিনোদনের উপায়—কোনদিনই এটাকে আমি জীবিকার উপায় হিসাবে দেখিনি। লেখবার বিষয় বাছাই করেছি আমি নিজে, সময় কতটা লাগবে তাও ঠিক করেছি নিজে নিজে, কী শর্তে লিখব তাও জানিয়ে দিয়েছি কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে।"

মেকলের রচনারীতির সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, তাঁর লেখায় কেবল অহঙ্কার ছিল না, বাগাড়ম্বরও ছিল প্রচুর। পরের কথাগুলোতে বাগাড়ম্বর অহঙ্কার দুইই খুব স্পষ্ট।

"বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছে আমি দিনমজুরে পরিণত হব; ভবিষ্যতে আমার লেখার উৎস হবে মানসিক পূর্ণতা নয়, পকেটের শূন্যতা; শ্রমক্লান্ত কল্পনাকে আমি চাবুক লাগিয়ে নিয়োগ করব অনিচ্ছাকৃত পরিশ্রমে; কাগজ বোঝাই করব

এই ভেবে যে কাগজ বোঝাই করাই আমার কাজ; প্রকাশকদের কাছ থেকে সহ্য করব সেই সব লাঞ্ছনা, ড্রাইডেন যা সয়েছিলেন টনসনের কাছ থেকে— এই ভাবনাটাই আমার কাছে অসহ্য।"

মেকলের এই অহঙ্কারকে নিন্দা করা যায় না—এটা একজন আত্মপ্রত্যয়শালী লেখকের সঙ্গত অহঙ্কার। আমিও নিন্দা করছি না,—আমার বলবার কথাটা এই যে, মেকলের ভারতযাত্রার পিছনে এই সঙ্গত অহঙ্কার এবং জীবিকা উপার্জনের সঙ্গত চিন্তাটাই বড় ছিল—ডেভিড হেয়ারের মতো ভারতবাসীকে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলার উদ্‌বেগ মেকলের ছিল না। ভারতে গিয়ে কত টাকা বেতন পাবেন, এ প্রশ্নটাও মেকলের কাছে যথেষ্ট দামী ছিল। বেতনের পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি বোনের কাছে লিখেছিলেন:

'The advantages are very great···the salary is ten thousand pounds a year' (সুযোগ সুবিধা অনেক, বেতনের পরিমাণ বার্ষিক দশহাজার পাউণ্ড।)

এই দশহাজার পাউণ্ড তিনি কিভাবে খরচ করবেন মেকলে তারও একটা হিসাব দিয়ে লিখেছিলেন:

"কলকাতার জীবনযাত্রার কথা যাঁরা ভালভাবে জানেন তাঁরা আমাকে জোর দিয়ে বলেছেন, বছরে (মাত্র) পাঁচ হাজার পাউণ্ড খরচ করলেই আমি ওখানে রাজার হালে থাকতে পারি। কাজেই বাকি পাঁচ হাজার পাউণ্ড আমি সুদ সমেত জমিয়ে ইংলণ্ডে ফেরার সময় (মাত্র) তিরিশ হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তি নিয়ে ফিরতে পারব। এর চেয়ে বেশি ঐশ্বর্য আমি কোনকালেই চাইনি।"

ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এই রকম চমকপ্রদ বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়েই মেকলে থামেননি। বোনকে আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন:

'I am not fond of money nor anxious about it" (টাকার লোভ আমার নেই, তা নিয়ে আমার হ্যাংলামিও নেই)।

মেকলের এই আত্মচরিত্রব্যাখ্যার উপর কোনো মন্তব্য করার দরকার নেই।

কিন্তু একটা প্রাসঙ্গিক কথা এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। মেকলের যুগের তিরিশ হাজার পাউণ্ডের দাম ছিল প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার সমান। সে যুগের সাড়ে চার লাখ টাকা বোধহয় এ যুগের "মাত্র" এক কোটি টাকার সমান। মেকলের বিবরণের অর্থ এই যে, চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার কিছু আগেই তিনি এই 'বিদুরের খুদটুকু' নিয়ে মহাসন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। সেইটেই তাঁর ভারতযাত্রার উদ্দেশ্য।

॥ তিন ॥

সে যাই হোক, জীবিকা সম্বন্ধে এই রকম সঙ্গত চিন্তা করতে করতে, সঙ্গত পরিশ্রমের দ্বারা, সঙ্গত বেতনলাভের আশায়, টমাস ব্যাবিংটন মেকলে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই—ভারতে এসে উপস্থিত হন। কবে উপস্থিত হন সেকথা আগেই বলেছি। তারিখটা হচ্ছে ১৮৩৪ সালের ১০ই জুন।

॥ চার ॥

'৩৪ সালের ১০ই জুন তারিখে মেকলের জাহাজ যখন মাদ্রাজের উপকূলে নোঙর করল, ঠিক সেই মুহূর্তে যে লোকটার সঙ্গে সুপ্রিম কাউন্সিলের এই নামজাদা সদস্যের সাক্ষাৎ হল, দুর্ভাগ্যক্রমে সে একটা মাঝিমাল্লা শ্রেণীর লোক। মেকলের চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় 'নেটিব' জাতের সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, এর আগে তিনি কোনো 'নেটিব' দেখেননি। মাঝিমাল্লা দেখে মেকলের মতো লোক আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবেন, এ জিনিসটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু এবার সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাই ঘটল। অবশ্য আহ্লাদের কিছু সঙ্গত কারণও ছিল। লোকটার গায়ের রঙ একেবারে কুচকুচে কালো, পোশাকের মধ্যে একটা টুপিই তার সম্বল, অথচ সাহেব সুবোর সঙ্গে সে কথাবার্তা চালাচ্ছিল ভারী বিচক্ষণ লোকের মতন। মেকলে বলেছেন :

"একেবারে ন্যাংটো গায়ে, মাথায় শুধু একটা শুঁড়ওয়ালা হলদে রঙের টুপি

চাপিয়ে লোকটা জাহাজে উঠে এল। কিন্তু জাহাজে উঠে সে কথাবার্তা বলতে লাগল এমন ভদ্রভাষায় এবং সপ্রতিভ কায়দায় যে, একদিকে তার এই কেতাদুরস্ত হাবভাব, আরেকদিকে তার ন্যাংটো চামড়া আর সেই ন্যাংটো চামড়ার পালিশের কথা ভেবে হাসতে হাসতে আমার দমবন্ধ হবার জোগাড় হল।"

এই বর্ণনা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটা কথা বলব। আমাদের এই অসভ্য দেশেও যখন নাগা সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউ পুরোপুরি ন্যাংটো থাকে না, তখন মেকলের ঐ ন্যাংটো লোকটার কোমরেও আমরা অন্ততঃ একটা নেঙটির অস্তিত্ব সন্দেহ করতে পারি। আর যদি ধরেই নিই যে লোকটা যথার্থই উলঙ্গ ছিল তবু সেই উলঙ্গতা ও সেই সপ্রতিভতার পিছনে একটা মর্মান্তিক দারিদ্র্যের ইতিহাস অনুমান করে নিতে আমাদের কষ্ট হয় না। মেকলের হাস্যরসের স্বরূপ বুঝতে হলে সেই ইতিহাসটুকু মনে রাখা চাই।

॥ পাঁচ ॥

যাই হোক, দিন কতক পরে আরও একটা ঘটনা ঘটল। এবারকার ঘটনাটার নায়ক মাঝিমাল্লা নয়, তবে খুব উঁচুদরের লোকও নয়। এবারকার নায়ক একজন 'নেটিব' চাকর—চামড়ার পালিশের দিক দিয়ে সেও বাদামী নয়, অন্ততঃ মেকলে তেমন কোনো খবর দিচ্ছেন না। ৭ই জুলাই তারিখের একটা চিঠিতে মেকলে লিখেছেন :

"জুলাই মাসের গরমে লণ্ডনে বসে তোমরা যখন ভাজা ভাজা হচ্ছ, আমি তখন উটকামণ্ডের হাড়-কাঁপানো শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি। আমার চারদিকে আমার কালা চাকরগুলো অবিশ্রাম কাশছে। একটি হতভাগ্যের অবস্থা এমনই যে শীগগির শীগগির যদি সূর্য না ওঠেন, তবে শেকস্পীয়রের মতে যেটা ইংরেজের চোখে ভারী মজার জিনিস, সেই জিনিসটাই আমাকে দেখতে হবে—দেখতে হবে একটি অক্কাপাওয়া ভারতবাসীকে। (I am likely to see under my

own roof the spectacle which according to Shakespeare is so interesting to the English—a dead Indian)".

এই বর্ণনার উপর টীকা চলে না।

॥ ছয় ॥

ইংলণ্ড থেকে মাদ্রাজ। মাদ্রাজ থেকে উটকামণ্ড। উটকামণ্ড থেকে কলকাতা। কলকাতায় এসে মেকলে স্থায়ী হয়ে বসেন। কলকাতার 'নেটিব' সম্বন্ধে (অর্থাৎ বাঙালী সম্বন্ধে) মেকলের মন্তব্য সুপরিচিত, কাজেই তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করব না। কিন্তু সে যুগের শহর কলকাতা সম্বন্ধে মেকলের মতামত অনেকেই জানেন না, কাজেই সে জিনিসটার একটু আলোচনা করা উচিত। কলকাতাকে আমরা 'নেটিব' বলতে পারি না, তার কারণ, এটা 'নেটিব'-এর শহর মাত্র, তাও আবার ইংরেজের তৈরি শহর। এই জন্যেই হোক আর যে জন্যেই হোক, কলকাতার ক্ষেত্রে মেকলের মনোভাবকে অনেকটা প্রসন্ন বলতে হয়। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ কলকাতার জলবায়ুকে তিনি সে যুগের সাধারণ ইংরেজদের মতো গালমন্দ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। "আই শুড্ সে দিস ক্লাইমেট ইজ এ্যাব্সার্ডলি ম্যালাইনড্"। কলকাতার জলবায়ুর বিরুদ্ধে একটু আধটু আপত্তি তিনি করেছিলেন, কিন্তু সেও তাঁর মতে অত্যন্ত সঙ্গত আপত্তি। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"এখানকার জলবায়ুর একটাই মাত্র জঘন্য দিক আছে। মানুষের গড়া প্রত্যেকটি জিনিসই এখানে একদম নষ্ট হয়ে যায় ; এর প্রায় কোনো ব্যতিক্রমই নেই। ইস্পাতে মরচে পড়ে! ক্ষুর ভোঁতা হয়ে যায়। সুতো গলে যায়। পোশাক-আশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দেয়ালের চটা উঠে যায়। পুঁথিপত্তরের বারোটা বাজে। প্রত্যেকটি বইয়ের বাঁধাই খসে যায়। কড়িবরগা পচে যায়। ম্যাটিং-এর সর্বনাশ হয়। বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়ে। প্রতি তিনবছর অন্তর এক একটা বাড়ি একেবারে নতুন করে মেরামত করতে হয়।"

অনেকে ভাবতে পারেন, একটা শহরের জলবায়ুকে এর চেয়ে 'এ্যাব্সার্ডলি ম্যালাইন্' কে কবে করেছে? এমন যাঁরা ভাবতে চান, মেকলের এই 'সঙ্গত' আপত্তির কারণ তাঁরা জানেন না। আসলে মেকলের নিজের প্রাসাদটাই ঐ 'তিনবছরী মেরামতের' ধাক্কায় পড়েছিল। তখন তাঁকে যে দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে মেকলে বলেন:

"গোটা ছ হপ্তার জন্য অভ্যস্ত অট্টালিকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর এবং সুন্দর সুন্দর ফুলবাগান ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হল নেটিব পাড়ার একটি গর্তে। সেখানে গিয়ে দিনের পর দিন নাকের মধ্যে নিতে হল নেটিব-রান্নার উৎকট বদ্গন্ধ, আর কানের মধ্যে নিতে হল নেটিব সঙ্গীতের কানে-তালা-লাগানো বিকট আওয়াজ।"

এই বিবরণ সম্বন্ধেও টীকা নিষ্প্রয়োজন।

॥ সাত ॥

এমন যে কলকাতা শহর, এইখানে বসেই টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তাঁর সুবিখ্যাত শিক্ষালিপিটা লেখেন। কবে লেখেন, সে তারিখটাও আমরা জানি। পূর্বোক্ত ঘটনাগুলোর শুরু থেকে আটমাসের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে, মেকলে তাঁর শিক্ষালিপিটা গবর্নর জেনারেলের কাছে পেশ করেন এবং ঐ বৎসর ৭ই মার্চ তারিখে সেই লিপির সারমর্ম লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক রাজাজ্ঞা হিসাবে প্রচারিত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষা আমাদের শিক্ষাদীক্ষার, আমাদের রাজকার্যের, আমাদের সংস্কৃতির—এক কথায় আমাদের সভ্যজীবনের প্রায় প্রত্যেকটি উপকরণের বাহন হয়ে আছে।

॥ আট ॥

এই হচ্ছে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, সে ইতিহাসের যেটুকু তার প্রধান নায়কের জীবনের সঙ্গে জড়িত

এটা তারই বিবরণ ; এ সম্বন্ধে আর যা কিছু জ্ঞাতব্য তার দায়দায়িত্ব টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নয়। কিন্তু উপরের কাহিনীটুকুর দ্বারা আমি একটা চরিত্রের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি ;—যে চরিত্র শুধুমাত্র মোটা বেতনের আশায় একটা বিরাট দেশের শাসনভার নিতে এগিয়ে আসে , যে চরিত্র কালো চামড়ার নেঙটিপরা লোক দেখলে হাসতে হাসতে আধমরা হয়ে যায় ; যে চরিত্র মরণাপন্ন ভারতবাসী দেখার অভিজ্ঞতাকে মস্ত একটা রসিকতা মনে করে ; এবং যে চরিত্র কলকাতার মতো বিশ্রী শহরের বিশ্রীত্বকেও এমন ভাষায় ব্যক্ত করে যার মধ্যে মাত্রাজ্ঞানের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার জিজ্ঞাস্য, এমন চরিত্রের লোক যখন ইংরেজিশিক্ষার মতো ভালো জিনিসকেও প্রচার করে, তখন সেই ভালো জিনিসের মধ্যেও সে কি একটা মহা বিপদের সম্ভাবনা ডেকে আনে না ? সে চরিত্র কি ঐ ভালো জিনিসের ভারতীয় গ্রহীতাদের চরিত্রকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে না ?

কিন্তু এ প্রশ্নের সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন মিশ্রিত হয়ে আছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন : ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীরা ১৯শ শতাব্দীর ভারতে একটা নবযুগ সৃষ্টি করেছিলেন—বাঙলা ও ভারতের 'রেনেসাঁসের' কারণ হয়েছিলেন। মেকলের ভারতদ্বেষী চরিত্র যদি তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তবে এটা কি করে সম্ভব হল ? প্রথমে এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

॥ নয় ॥

এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে ভেবে দেখতে হয় : মেকলের ভারত-প্রবাসের আগে এবং হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) প্রায় সমসময়ে কারা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার গুরু ছিলেন ? হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় ঐ শ্রেণীটির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

"এখন আর সে কাল নাই, বাঙালী বড়মানুষদের অনেক সভ্য হয়েচেন। গোলাবজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের

চুন দিয়ে পান খাওয়া, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কর্তে যাওয়া, যাত্রায় নোট প্যালা শহরে অতি কম হয়ে পড়েছে। আজ্ঞা হুজুর, উঁচু গদি, কাত্তিকের মত বাউরি-কাটা চুল একপাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকানো কাছা, জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পের মতো কথনোর পাল্লায় পড়েছে।"

এই বিবরণ পড়লেই বোঝা যায়, মেকলের সমসাময়িক বাঙালী-চরিত্র, অন্ততঃ তার উচ্চশ্রেণীর চরিত্র, কোন্ স্তরের জিনিস ছিল। ইংরেজিশিক্ষা সেদিন বাঙালী মনকে হঠাৎ জাগিয়ে দিয়েছিল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর পেতেও অসুবিধা হয় না। মেকলের মতো লোকের দ্বারা প্রচারিত হয়েও ইংরেজিশিক্ষা সেদিন বাঙালী মনের নব-জাগরণের কারণ হয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা রহস্য-জনক বিষয়। কিন্তু হুতোমের এই বিবরণ পড়ার পর এ রহস্যের আংশিক সমাধান আমরা সহজেই খুঁজে পাই। আসলে সেদিনকার বাঙালী মন এমনই বদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে ইংরেজ মনের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার এদেশে যে হাত দিয়েই আসুক ভারতবাসীর চিত্তকে তা অতি সহজেই ঐশ্বর্যবান করতে পেরেছিল। কিন্তু এই ঐশ্বর্যবত্তার যে একটা বিপরীত দিক ছিল সে জিনিসটাও হুতোমের চোখ এড়ায়নি। তিনি নূতন ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীকে বলেছিলেন, 'ইংরেজি কেতার বাবু'। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের দাম অনেক বেশি।

॥ দশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে,

'যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশন্যাল থিয়েটার, তিনিই বাবু। যিনি মিশনারির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু'।

এই বিবরণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি। বাঙলা ও ভারতের রেনেসাঁস যাঁদের সৃষ্টি তাঁদের মনস্তত্ত্বটুকু বঙ্কিম অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন—কোনো

ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এ জিনিসটা আমরা পাই না। 'গোলাব-জল দিয়ে জলশৌচ-' করা বাবুর দল হঠাৎ একটা শ্রেষ্ঠতর বাবু-সমাজের দ্বারা নিরাকৃত হল, ঘুমন্ত দেশে হঠাৎ নব-জাগরণের সাড়া পড়ে গেল, এমন কোনো ছেলেমানুষি বিবরণ বঙ্কিম দেননি। বরং এমন ইঙ্গিতই তিনি করেছেন যে, এই নূতন বাবু-সমাজও ভণ্ড, বিকৃত এবং কপটাচারী। সন্দেহ নেই, ভারতে ইংরেজিশিক্ষার যিনি জনক সেই মেকলে এবং তাঁর সমজাতীয় লোকদের চরিত্রের অনিষ্টকর প্রভাব থেকেই এসব জিনিসের উৎপত্তি। একথা ঠিক, মেকলে ভণ্ডও ছিলেন না, বিকৃতও ছিলেন না, কপটাচারীও ছিলেন না। কিন্তু আমরা দেখেছি ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে তিনি গোড়াতেই একটা বিশ্রী মনোবৃত্তি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। নেটিব জাতের প্রতি তিনি যে ঘৃণার বীজ বপন করেছিলেন শিক্ষিত নেটিবের মনে সেটা স্বজাতি সম্বন্ধে ঘৃণামিশ্রিত লজ্জার আকার ধারণ করেছিল। অধিকাংশ লোকের চরিত্রে লজ্জা আর কপটতা একই টাকার এপিঠ-ওপিঠ, কাজেই ইংরেজি শিক্ষিত 'বাবু' বাঙালীর সেদিনকার সেই বিকৃতি, ভণ্ডামি ও কপটাচার তাদের মনের ঘৃণামিশ্রিত লজ্জারই ফল।

তাই যদি হয়, তবে ইংরেজিশিক্ষিতদের দ্বারা সেদিনকার বাঙলার 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ ঘটল কী করে? বঙ্কিম তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাঙলার নবজাগরণের কারণ সেদিনকার ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর চরিত্রের একটা দোটানা। অবশ্য দোটানা থেকেও ভণ্ডামি আসে, বঙ্কিম তারই উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু সেদিনকার বাঙালীর চরিত্রের দোটানার মধ্যে কিছু ভালো জিনিসের বীজও ছিল। মিশনারির কাছে যে খ্রীষ্টান এবং বাপের কাছে যে হিন্দু তার ক্রিয়াকলাপকে পুরোপুরি কপটতা ভাবার কারণ নেই—ইংরেজের সমাজকে যে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে চায়, তার পক্ষেও সেদিন এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী ছিল। রমেশ দত্তর মতো পাকা সাহেবকেও সে যুগের একজন ইংরেজ আমলা পার্টিতে ডেকে নিয়ে আলাদা টেবিলে খানা খাইয়েছিলেন—সাহেব-মেমের টেবিলে তাঁর ঠাঁই হয়নি। মাইকেলের মতো ভাহা ইংরেজকেও সেদিন স্পেন্সেস্ হোটেলের খানা খেয়েই সাহেবিয়ানার সখ

মেটাতে হয়েছিল। এ অবস্থায়, একদিকে ইংরেজের উন্নত সমাজ, আরেকদিকে অনুন্নত নেটিব সমাজ, এই দুই আকর্ষণ-কেন্দ্র সমুদ্ভূত দোটানা সেদিনকার ইংরেজি-শিক্ষিত 'নেটিবের' ঘৃণামিশ্রিত লজ্জাটাকেও দুটো উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত করবার কারণ সৃষ্টি করেছিল। সেদিনকার শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা জাতীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের ঘৃণাকে রূপ দিয়েছিলেন বিচারশক্তির আকারে, লজ্জাকে রূপ দিয়েছিলেন বিচারশীল শ্রদ্ধার আকারে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। অশিক্ষিত গ্রাম্য মায়ের প্রতি লায়েক সন্তানের ঘৃণামিশ্রিত লজ্জাকে অনেক সময় এই রকম বিচার-শক্তি ও বিচারশীল শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। কাজেই 'বাঙলার জাগরণ' সেদিনকার শিক্ষিত বাঙালী চরিত্রের দোটানার ফল। বঙ্কিম আরো বলেন:

'যিনি গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন তিনিই বাবু'।

'গৃহিণীর অনুরোধে' কথাটা খুব দামী। এর দ্বারা বোঝা যায় সেদিনকার বাবু বাঙালীর দোটানা শুধু 'সামাজিক' নয়, পরিবারগত দোটানাও সেদিন অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখানেও বঙ্কিম কপটতার দিকটাতেই জোর দিয়েছেন, কিন্তু এই পরিবার-গত দোটানারও একটা ভালো দিক ছিল। এরই ফলে, সেদিনকার বাবু বাঙালীরা (আজকের অনেক বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়ের মতো) মেম সাহেব বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন না; —নিজের ঘরের জ্ঞানদা-মোক্ষদাকেই তাঁরা কামিনী রায় বা সরলা দেবীতে রূপান্তরিত করবার জন্য যত্নবান হতেন। কাজেই পরিবার-গত দোটানাও সেদিনকার বাঙলা ও ভারতের মানসিক নবজাগরণে সাহায্য করেছিল।

॥ এগার ॥

বাঙলার 'রেনেসাঁসের' এই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরে একথা বুঝতে কারোই কষ্ট হবে না যে, মেকলের চরিত্রের ক্ষয়কারক প্রভাবটা সে[illegible] একটা সামাজিক

এবং একটা পারিবারিক বাধার দ্বারা চাপা পড়েছিল মাত্র—কিন্তু কোনোদিনই তা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেনি। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল 'পারিবারিক' বাধাটা আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে যাচ্ছে—বাবু বাঙালীর বাপ-মা-ভাই-বোন এমন কি গৃহিণী পর্যন্ত, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে, অতি দ্রুতবেগে বাবুর শ্রেণীতে প্রমোশন পাচ্ছে। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের আগে পর্যন্ত 'সামাজিক' দোটানা-লোপের উপায় ছিল না—কিন্তু অচিরেই পারিবারিক দোটানা থেকে মুক্তি ঘটল। রবীন্দ্রনাথের লেখায় তারও বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে।

॥ বার ॥

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' গল্পটা তিনটি ইংরেজি শিক্ষিত পরিবারের সংস্পর্শ ও সংঘাতের কাহিনী। এক, যোগমায়ার পরিবার—লাবণ্য যার অংশ। দুই, অমিত রায়ের পরিবার। তিন, কেটি মিত্তিরের পরিবার। গল্পটার সমাজ-তাত্ত্বিক তাৎপর্য এই যে, লাবণ্য যে সমাজের অংশ সেটা ইংরেজিশিক্ষিত হলেও তাতে পারিবারিক দোটানা খুবই বেশি। অমিত ও কেটিদের পরিবারে দোটানা নেই, কাজেই দু পক্ষের সম্মতি ও ভালোবাসা সত্ত্বেও অমিত-লাবণ্যের মিলন হতে পারে না, অমিতকে তার আপন সমাজে ফিরে গিয়ে কেটি মিত্তিরকেই বিয়ে করতে হয়। উপন্যাসের যে দৃশ্যে এসে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদটা অপরিহার্য হয়ে উঠল, সে জায়গাটা একটু খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যায়, বিচ্ছেদের কারণ সেখানে শুধু চরিত্রঘটিত নয়,—তার চেয়ে বেশি, পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার একান্ত বৈসাদৃশ্য-ঘটিত। দৃশ্যটা সুপরিচিত। অমিতের বোন সিসি এবং নরেন মিটারের বোন কেটি অমিতের খোঁজে যোগমায়ার বাড়িতে এসেছে। যোগমায়া অমিতকেই চেনেন, কাজেই সিসিকে দেখে তিনি খুব আগ্রহ করে তাকে 'মা' বলে ডেকে সমাদর করতে চাইলেন। কিন্তু সিসি ও কেটির কাছ থেকে সেই সমাদরেরযে জবাব এল, সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত; ওরা যোগমায়াকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সিগারেট জ্বালবার জন্যে 'ম্যাচেসের' সন্ধান করতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

"যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন 'শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।'

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। ··চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না।

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত।···নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে"।

॥ তের ॥

রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা পড়ে বোঝা যায়, ইংরেজি শিক্ষিত 'বাবু'-সমাজের যে দোটানার ফলে বাঙলা ও ভারতের রেনেসাঁস, সে দোটানা কোনো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়, কেননা বঙ্কিম-বর্ণিত ঐ বাবু-সমাজটাই চিরস্থায়ী নয়। কেটি মিত্তির যে বাবু-সমাজের প্রতিনিধি তার মধ্যে কোনো দোটানা নেই। কেটিদের গোটা পরিবারটাই এক ছাঁচে ঢালা—সেখানে বাপ-ঠাকুরদা, এমনকি মেয়েদের কাছেও 'হিন্দু' সাজবার দরকার করে না। দোটানা আছে লাবণ্যের মধ্যে, সে ইংরেজি-শিক্ষিত হয়েও 'নেটিব'-সমাজের বাঁধনে সারা জন্মের মতো বাঁধা ; যোগমায়ার সামনে সিগারেট জ্বালানো তার পক্ষে অসম্ভব। লাবণ্য, বঙ্কিম-বর্ণিত বাবু-সমাজের যারা শ্রেষ্ঠ—তাদেরই অন্তিমকালের প্রতিনিধি। কেটি মিত্তির 'নেটিব' সমাজ-রজ্জুর সব কয়টি পারিবারিক গ্রন্থিচ্ছেদনকারী মেকলের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। বঙ্কিম-যুগে এ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়নি—রবীন্দ্রনাথ যখন এদের বিবরণ দিয়েছেন

তখন তাঁরও জীবনের সায়াহ্নকাল উপস্থিত।—ততদিনে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের এক অংশ থেকে পারিবারিক দোটানা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।

॥ চোদ্দ ॥

সামাজিক দোটানা ঘুচেছে স্বাধীনতার পরে; আজ আমরা সেই পরিবেশেই বাস করছি।

স্বাধীনতার পরে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণীর চরিত্রে কোন্ লক্ষণটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়বার মতো হয়েছে? কেটি মিত্তিরের মতো মেয়েদের এখন আর অমিত রায়কে 'অমিট্রায়ে' সাজিয়ে বিয়ে করতে হয় না, সোজাসুজি বিলেতে গিয়ে বা না গিয়ে মিসেস জোন্‌স্ বা মিসেস ব্রাউন হওয়া যায়—এইটিই কি সেই লক্ষণ? তা হয় তো নয়, কেননা ইউরো-এশিয়াটিক বিয়ের ব্যাপক প্রচলনে বাধা আজো দুস্তর। কিন্তু এমন বিয়ের সংখ্যা আজো যতই কম হোক, আজকের ইংরেজিশিক্ষা যে জাতীয় সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দোটানা লোপ করছে তার অনেক প্রমাণ আছে। (১) এককালে ধুতিচাদরকে হ্যাটকোট দিয়ে উপহাস করা হত, কিন্তু আজকের দিনে হ্যাটকোট আর ড্রেইন পাইপের মধ্যে কেউ বড় একটা বাছাবাছি করে না। দোটানা থাকলে এটা সম্ভব হত না—সে ক্ষেত্রে আমরা কেবল ধুতিচাদরে নয় হ্যাটকোটেও কিঞ্চিৎ উগ্রতা দেখতে পেতাম। বিদ্যাসাগরের ধুতিচাদর আর মাইকেলের হ্যাটকোট সেযুগের দোটানার একটা 'ক্লাসিক' দৃষ্টান্ত—এ যুগে ওরকম দৃষ্টান্তের কথা ভাবা যায় না। (২) এককালে ঠিক আজকের মতোই সীতাসাবিত্রীর আদর্শকে উপহাস করা হয়েছে, কিন্তু সে যুগের নারী-আদর্শটা সচরাচর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নীচে নামত না। আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং ম্যারিলিন মনরোর দর সম্পূর্ণ সমান বললেও অন্যায় হয় না। এখানেও দোটানার অভাবটাই আমাদের চোখে পড়ে। আরো চোখে পড়ে, দোটানাবিহীন ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের গতি কেবল বিদ্যাসাগরের ভারত থেকেই দূরে নয়—মাইকেলের ইংলণ্ড থেকেও দূরে,

সীতাসাবিত্রীর ভারত থেকেই দূরে নয়—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ইংলণ্ড থেকেও দূরে।

॥ পনের ॥

তাই যদি হয় তবে আরও একটা কথা আমাদের ভেবে দেখতে হয়। আমি আগেই বলেছি, মেকলে এবং তাঁর সমজাতীয় চরিত্রের লোকদের প্রভাব সেযুগে সম্পূর্ণ বাধাবিহীন হতে পারেনি বলেই ইংরেজিশিক্ষা আমাদের মনকে জাগিয়ে দিয়েছিল। আজ সে প্রভাব সম্পূর্ণ বাধাবিহীন হয়েছে, কেননা যে দোটানা তাতে বাধা দিয়েছিল তা আজ দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। কাজেই স্বাধীন ভারতের ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণীর পক্ষেই 'মেকলের সম্প্রদায়' নামটি যথার্থভাবে খাটবার উপক্রম হয়েছে। এ ঘটনা আশ্চর্য, কেননা মেকলের জীবদ্দশায় নয়, তার মৃত্যুর প্রায় একশো বছরের মধ্যেও নয়—একেবারে হাল আমলেই তাঁর সম্প্রদায় ভারতের শিক্ষিত সমাজে একচ্ছত্র রাজপাট লাভ করেছে। হুতোমের যুগে যা ছিল বীজ, বঙ্কিম যার অঙ্কুর দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যার চারাগাছের বিবরণ দিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতেই সেটা মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে।

ডিরোজিয়ানদের কথা

॥ এক ॥

ইদানীংকালে ডিরোজিও এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের নিয়ে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। অনেকে বলছেন, তাঁরা একটা 'চিন্তাবিপ্লব' ঘটিয়েছিলেন, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, 'মুক্তবুদ্ধির' পথ পাকা করেছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক বিচার করলে এসব কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় না। প্রকৃত তথ্য এই যে, ডিরোজিও ছিলেন একজন প্রতিভাশালী, সচ্চরিত্র, অপরিণতমনা, বাইশ-তেইশ বছরের যুবক, যিনি কোনদিন চব্বিশের মুখ দেখেননি। একজন বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে চিন্তাবিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়, ইতিহাসে এমন নজির নেই। একথা ঠিক, ডিরোজিওর শিষ্যরা অনেকেই বাইশ পার হয়েছিলেন, কেউ কেউ সত্তরের কোঠাও অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও প্রকৃত কর্মজীবন বিশ-বাইশ বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদচ্যুতি এবং প্রাণবিয়োগের বছর ১৮৩১; তাঁর শিষ্যদের প্রভাবও ত্রিশের দশক অতিক্রম করেনি। অতি দ্রুতবেগে আবির্ভাব হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা', কেশবচন্দ্র সেন ও বিদ্যাসাগরের; ডিরোজিয়ানদের প্রভাব ততদিনে নগণ্য হয়ে আসে। তাঁদের এই ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের যুগে ডিরোজিও-শিষ্যরা হিন্দুসমাজে একটা মদ-গোমাংস ঘটিত উপদ্রব সৃষ্টি করেন, কিন্তু মদ মাংসের বিপ্লবের যা স্বাভাবিক পরিণতি, সেই অনিবার্য অকালমৃত্যু তাঁরা এড়াতে পারেননি। দেশের নৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক কোনো চৈতন্যেই তাঁরা সাড়া জাগাতে পারেননি—তাঁদের ক্রিয়াকলাপ থেকে কোনা স্থায়ী ফলও ফলেনি।

(১) তাঁরা যে দেশের নৈতিক চৈতন্যে সাড়া জাগাতে পারেননি, তার

প্রমাণস্বরূপ বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার এবং বেথুনের নাম করাই যথেষ্ট। শেষোক্তদের নাম করছি এইজন্য যে তাঁরা ছিলেন বিদেশীয়—ডিরোজিও-শিষ্যরা আমাদের স্বজাতি। কিন্তু হেয়ার-বেথুন বিদেশীয় হলেও তাঁদের মৃত্যুতে সে যুগের হিন্দু-সমাজ যেমন অকপটে অশ্রুপাত করেছিল, কোনো ডিরোজিও-শিষ্য সম্বন্ধে তেমনটি করতে শোনা যায়নি। অতি সাধারণ ঘরের হিন্দুরাও ডেভিড হেয়ারকে পরমাত্মীয় মনে করত। এ ঘটনা আশ্চর্য, কেননা যে যুগে সাহেব-লোকের নাম শোনামাত্রেই সাধারণ হিন্দুরা থর থর করে কাঁপত, এবং কাঁপুক না কাঁপুক, ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শের ভয়ে বিশহাত তফাত থাকত, সেই যুগেই তারা হেয়ারকে ঘরের লোক ভাবতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। আসলে হেয়ার হিন্দুসমাজের নৈতিক বুদ্ধির সবচেয়ে অসাড় জায়গাটিতে আঘাত করেছিলেন। ম্লেচ্ছবিদ্বেষ হিন্দুসমাজের সবচেয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার। হেয়ার ঐ সংস্কারে আঘাত দিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। হেয়ারের এক ছাত্রের অসুখ করেছে; খবর পেয়ে দিনান্তে হেয়ার সেখানে উপস্থিত। অন্ধকারে, ঘরের সামনে গৌরমূর্তি দেখে বাড়ির লোক ভয়ে জড়সড়। হেয়ার সাড়া দিয়ে বললেন, ডরো মৎ, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়। অমনি সকলে ছুটে এসে হেয়ারকে ডেকে নিয়ে ঘরে বসাচ্ছে।—শিবনাথের এগল্প প্রামাণিক কিনা জানি না। কিন্তু কোনো ডিরোজিও-শিষ্য সম্বন্ধে এমনধারা অপ্রামাণিক গল্পও আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। সকলেই জানেন, ডিরোজিয়ানরা বিদ্যাসাগরের অনেক আগে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে লেখালেখি শুরু করেন। একথা মানতেই হবে তাঁরা কোনো বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি; তাছাড়া বিধবাবিবাহের ব্যাপারে আইনপাশের জন্যও তাঁরা সচেষ্ট হননি। কিন্তু এটাকে তাঁদের ন্যূনতা বলা যায় না। বিদ্যাসাগর আইন পাশ করিয়েছিলেন বটে, কিন্তু আইন পাশের দ্বারা তিনি ডিরোজিয়ানদের চেয়ে বড় সার্থকতার অধিকারী হয়েছিলেন একথা সত্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে

১৯শ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলনে বিধবাবিবাহের চেয়ে বড় ব্যর্থতার আর কোনো নজির নেই। বিদ্যাসাগর যে কয়টি বিধবাকে দাম্পত্যসুখের রাস্তা দেখিয়েছিলেন তাঁদের বিধবাবিবাহের পুরো ইতিহাস আমরা পাইনি। কিন্তু এটুকু মোটের উপর পরিষ্কার যে অনেক বিধবাবিবাহই টাকার লোভে ঘটেছিল। কেউ কেউ টাকা নিয়ে বিধবা বিয়ে করেছিলেন, পরে যথাশাস্ত্র একটি কুমারী বিয়ে করতেও ভোলেননি। বিদ্যাসাগর নিজে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সর্বস্বান্ত হয়েও সাফল্যের পরিতৃপ্তি পেয়েছিলেন, এমন কথা ইতিহাসে লেখে না। কাজেই বিধবাবিবাহের ব্যাপারে ডিরোজিয়ানদের কৃতিত্বকে বিদ্যাসাগরের চেয়ে কম বলা যায় না। দু'পক্ষের কৃতিত্বই শূন্য পরিমাণ, কমবেশির তর্ক এখানে অর্থহীন।

কিন্তু—এই 'কিন্তু'টাই এক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা—ডিরোজিয়ানরা যেখানে হিন্দুসমাজের চর্মস্থলেও আঁচড় কাটতে পারেন নি, বিদ্যাসাগর সেখানে তার একেবারে মর্মস্থলে নাড়া দিয়েছিলেন। হিন্দুরা সে যুগেও বিধবার বিয়ে দেয়নি, এযুগেও দেয় না। কিন্তু এই একটা ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে, যেখানে হিন্দুর হিন্দুয়ানি কার্যক্ষেত্রে বজায় থাকলেও তার মধ্যে একটা নিদারুণ সঙ্কোচের ভাব মিশেছে। যত বড় উগ্র হিন্দুই হোক, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে চট করে কোনো মতামত দিতে গিয়ে আজকাল সে একটু থমকে দাঁড়ায়। সে যুগের বালবৈধব্য কি নিদারুণ ব্যাপার ছিল, ব্রহ্মচর্যের নামে সে যুগে কত ভ্রূণহত্যা ও নারীহত্যা হত, সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস স্মরণ করে সে স্তব্ধ হয়। সে ইতিহাস সত্য কিনা আজকের বাঙালী তা যাচাই করে দেখে না। সে কেবল এইটুকু মনে রাখে যে, সে ইতিহাস বিদ্যাসাগর বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই বিচারহীন বিশ্বস্ততায় বাঙালী যে সম্পূর্ণ লাভবান হয়েছে একথা বলা যায় না। কার্যক্ষেত্রে বাঙালী আজো রক্ষণশীল থেকে গেছে। কিন্তু মতামতের ব্যাপারে আজকাল আমাদের মধ্যে যে বিচারহীন প্রগতিশীলতা দেখা যায় তার সঙ্গে ঐ কার্যক্ষেত্র-ঘটিত তফাত বাঙালী চরিত্রে এক নূতন ভণ্ডামি এনে দিয়েছে যার ফল সে যুগের বাক্যগত

ব্রহ্মচর্য এবং কার্যগত ভ্রূণহত্যার চেয়ে কম নিদারুণ নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রতি বিশ্বস্ততার এই অবান্তর ফল যতই শোচনীয় হোক—একটি মাত্র মানুষ একটি সর্বতোভাবে ব্যর্থ প্রচেষ্টার দ্বারা একটা গোটা সমাজের বিবেকবুদ্ধিকে এমন করে নাড়া দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিদ্যাসাগর এমনি করেই বাঙালী হিন্দুর বিবেকবুদ্ধিকে নাড়া দিয়েছিলেন। ডিরোজিয়ানরা কেবল যে নাড়া দিতে পারেননি তাই নয় বরং হিন্দু রক্ষণশীলতাকে কিছুদিনের জন্য তাঁরা আরো উগ্র করে তুলেছিলেন। হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগরকে বলত 'দয়ার সাগর' আর ডিরোজিওকে বলত—'হায়াহীন ড্রজু ভায়া';—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলত—'কেষ্টা বন্দ্যো', 'বন্দ বাপা', 'পেটকো ফিরিঙ্গি মুচি কৃষ্ণা' ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, রামমোহনকেও তারা 'নগরান্তেবাসী' 'যবনীজার' প্রভৃতি মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করত। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সমাজ আজও এক বিশেষ প্রকৃতির ধর্মবুদ্ধি ও নৈতিক বুদ্ধির স্বাক্ষর হিসাবে বিদ্যমান আছে। ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানদের নৈতিক বুদ্ধির স্বাক্ষর খুঁজতে হলে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বেরোতে হয়,—তাতেও কুলোয় কিনা সন্দেহ।

(২) ডিরোজিয়ানদের অন্যান্য কীর্তির কথা সবিস্তারে আলোচনার যোগ্য নয়। তাঁদের সমাজসংস্কারের কথা আগেই বলেছি। তাঁদের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই যথেষ্ট। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিয়ানদের মধ্যে বাঙলা ও ইংরেজি রচনায় সবচেয়ে খ্যাতিমান লোক। রবীন্দ্রনাথ এক সভায় এঁর বাঙলা রচনায় 'দন্তস্ফুট' করবার জন্য তাঁর শ্রোতাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু আরেকজন মহাপণ্ডিতের কথা বলেছিলেন।—ইনি 'অভিনন্দন পত্র' বলতে পারতেন না, বলতেন—'রঘুনন্দন পত্র'। এমনি ছিল ডিরোজিয়ানদের বাঙলা জ্ঞানের বহর।

(৩) ডিরোজিয়ানদের একমাত্র সাফল্য রাজনীতিক্ষেত্রে। বঙ্কিমচন্দ্র

---

* টেকচাঁদ ঠাকুর এ কথার ব্যতিক্রম কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরকে ডিরোজিয়ান বলা যায় কিনা সন্দেহ।

লিখেছিলেন : "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে"। এই রামগোপাল ঘোষ ছিলেন ডিরোজিওর এক প্রধান শিষ্য। স্থরেন বাঁড়ুজ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশংসাবাদ করেছেন। তবে এও মনে রাখতে হবে রামগোপাল বা কৃষ্ণমোহন যে ধরনের রাজনীতি করতেন সেটা ব্রিটিশ গবরমেণ্টের উদ্দেশে নতজানু ও সাষ্টাঙ্গপ্রণত কৃপাপ্রার্থীর রাজনীতি—পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ যেটাকে 'আবেদন নিবেদনের রাজনীতি' নাম দিয়েছিলেন। স্বদেশী মুভমেণ্ট-এর সময় থেকে ঐ রাজনীতির অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে আধুনিক ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের মুখবন্ধরূপে এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছেই। এইটেই ডিরোজিয়ানদের সবচেয়ে বড় কীর্তি।

॥ দুই ॥

ডিরোজিয়ানদের কীর্তির একটা দিক এই। আরেকটা দিকের কথাও এখানে আলোচনা করা উচিত, যদিও আজকালকার ডিরোজিওভক্তদের লেখায় এদিকটার উপর একটা পর্দা টেনে দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ডিরোজিয়ানদের সামাজিক বিদ্রোহের দুটি বড় নিদর্শন সে যুগের হিন্দুসমাজে খুব গভীর ছাপ ফেলেছিল। সে দুটি বিধবাবিবাহও নয় স্ত্রীশিক্ষাও নয়—মদ আর গোমাংস। ডিরোজিয়ানরা বিধবাবিবাহ ইত্যাদির কথা কাগজে লিখতেন, কিন্তু যে সমাজ-বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত তাঁরা জীবনে স্থাপন করতেন সেটা মদ, গোমাংস এবং 'মুসলমানের দোকানে' বিস্কুট-পাঁউরুটি খাওয়ার দৃষ্টান্ত। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রের একটি বিখ্যাত উক্তি তুলে ধরেছিলেন। ডিরোজিয়ানরা কী প্রণালীতে সমাজবিপ্লব করেছিলেন ?—ঐ সংবাদপত্রের মতে—[By] "cutting their way through ham and beef and wading to liberalism through tumblers of beer." "একেই কি বলে সভ্যতা ?" পুস্তকে মাইকেলের সাক্ষ্যও ঐ ; —মাইকেল এটাকে সভ্যতা বলতে রাজি ছিলেন

না। কিন্তু এ সম্বন্ধে মাইকেলের বন্ধু রাজনারায়ণ বোসের সাক্ষ্য আরো বেশী প্রামাণিক এবং দৃষ্টান্তবহুল। রাজনারায়ণ স্পষ্টই বলছেন: 'ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদের এমনই সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন এক-এক গ্লাস মদ খাওয়া [এক-একটি] কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা'। 'একজন প্রসিদ্ধ ইয়ংবেঙ্গল বলিতেন, প্রত্যহ এ বেলা অর্ধসের আর ও বেলা অর্ধসের গোমাংস ভক্ষণ না করিলে বাঙালী জাতি কখনোই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্যে তাহাই করিতেন'। রাজনারায়ণের কিঞ্চিৎ রসবোধ ছিল। তিনি এই ইয়ং বেঙ্গলের শেষ পরিণামের কথাও উল্লেখ করেছেন।

'পরিশেষে এক ত্বাচ রোগ উপস্থিত হইয়া শরীর এমনই অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া ভাত ডাইল ধরিতে বাধ্য হইলেন'।

ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদের 'জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত এবং সুসংস্কৃত মনের কার্যের' আরও অনেক উদাহরণ রাজনারায়ণ দিয়েছেন।—দুই বাবু-বাঙালী উইলসনের দোকানে ঢুকেছেন। উইলসনের দোকান সে যুগের ইয়ং বেঙ্গলদের প্রসিদ্ধ আড্ডা-খানা। এক বাবু veal চাইলেন। খানসামা বলল: নহি হ্যায় খোদাবন্দ্‌। তখন Beef steak চাইলেন। খানসামা বলল: ওভি নহি হ্যায় খোদাবন্দ্‌। তখন চাইলেন Ox tongue. খানসামা বলল: ওভি নহি হ্যায় খোদাবন্দ্‌। এর পর চাইলেন Calf's foot jelly। খানসামা একই উত্তর দিল। তখন বাবু একটু অধীর হয়ে বললেন: 'গোরুকা কুছ হ্যায় নহি'? এবার খানসামার জবাবের আগেই দ্বিতীয় বাবু বলে উঠলেন: "ওরে, আর কিছু না থাকে একটু গোবর এনে দেনা।"—অবশ্য রাজনারায়ণ এটাকে গল্প বলেই উল্লেখ করেছেন, প্রামাণিক বলেননি। কিন্তু ডিরোজিয়ানরা যেখানে দল বেঁধে মুসলমানের দোকানে বিস্কুট কিনতে যাচ্ছেন এবং দোকানের কাছাকাছি এসে 'বিদ্রোহী আত্মারা' ভয়ে একেবারে কাঠ মেরে গেছেন, সবশেষে একজন একটু সাহস করে বিস্কুট খরিদ করা মাত্র অন্যেরা Hip Hip Hurrah শব্দে এই "সুসংস্কৃত মনের কার্যের" নামে জয়ধ্বনি

করছেন—তার বর্ণনা প্রামাণিক বলেই মনে হয়।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরেকজন ডিরোজিয়ানের কথা লিখেছেন—ইনি ইংরেজি বিদ্যায় 'বৃহস্পতি'। ইনি রাস্তায় মুটে-মজুর যাকে দেখতেন তাকেই বলতেন "গোরু খাবি? গোরু খাবি?" কেউ যদি এমনধারা সমাজবিপ্লব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করত তখন ইনি বলতেন: "ওরা তো খাবেই না জানি, কিন্তু বারবার বলতে বলতে আইডিয়াটা আর 'শকিং' বোধ হইবে না"।—হরপ্রসাদ নিজে আদৌ শক্‌ড্ হন নি, তিনি বরং ব্যাপারটার তারিফ করেছেন।

॥ তিন ॥

এই হচ্ছে ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের কীর্তিপরিমাপযন্ত্রের দুই দিকের পাল্লা। পাল্লার একদিকে আছে নৈতিক বোধ, সমাজসংস্কার, রাজনীতি, সাহিত্যচর্চা প্রভৃতি বড় বড় বিষয়। আরেকদিকে আছে মদ-গোমাংস এবং "মুসলমানদের দোকানের" বিস্কুট। কোন্ দিক ভারী সেটা যাচাই করতে হলে একটা কথা মনে রাখা উচিত।—কিশোরীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, রাজনারায়ণ বোস,—এঁরা প্রত্যেকেই ডিরোজিও যুগের লোক; প্রত্যেকেই ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; প্রত্যেকেই ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষরূপে ওয়াকিবহাল। কাজেই আজকাল যাঁরা ডিরোজিয়ানদের প্রশংসায় লম্বাচৌড়া প্রবন্ধ ফাঁদতে সুরু করেছেন তাঁদের কথার চেয়ে এঁদের সাক্ষ্যের দাম অনেক বেশি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁদের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর কাহিনীটা সামান্য হেরফের সমেত রাজনারায়ণের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে, কাজেই তাঁর সাক্ষ্যের দামও বেশি। এই সমস্ত সমসাময়িক লেখকেরা প্রত্যেকেই একবাক্যে বলছেন, ডিরোজিয়ানদের কীর্তি মদমাংস এবং মুসলমানের দোকানের বিস্কুট সহযোগে জ্ঞানালোক-প্রচার এবং এক এক গ্লাস মদকে এক একটি কুসংস্কারের উপর জয়লাভের প্রতীক বলে মানা। কাজেই আজকাল যাঁরা বড় বড় প্রবন্ধ ফেঁদে গম্ভীরভাবে জানাচ্ছেন, ডিরোজিয়ানরা

দেশে একটা 'চিন্তাবিপ্লব' ঘটিয়েছিলেন তাঁরা কেবল নিজেদের 'চিন্তাবিপ্লব' সংক্রান্ত ধারণার দারিদ্র্য প্রকাশ করছেন, ডিরোজিয়ানদের গৌরব মোটেও বাড়াচ্ছেন না।

॥ চার ॥

যাঁরা এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও বিশ্বাস করেন, মদমাংস দিয়ে 'চিন্তাবিপ্লব' তথা সমাজবিপ্লব ঘটানো যায়, কোনো বুদ্ধিমান লোক তাঁদের 'মুক্তবুদ্ধি' সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করতে পারে না। একথা মানতেই হবে, ডিরোজিওর যুগে মদ-গোমাংস সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের যে ভাব ছিল সেটাও ভালো ছিল না। মদ-গোমাংস না খেলেই ধার্মিক হওয়া গেল—এ অত্যন্ত ছেলেমানুষী কথা। কিন্তু ধর্ম যে ভাতের হাঁড়িতে কিম্বা গঙ্গাজলের বোতলে থাকে না, এ শিক্ষার জন্য আমরা বিবেকানন্দের কাছে ঋণী, ডিরোজিও-শিষ্যদের কাছে ঋণী নই। হিন্দু-ধর্ম বলতে যে নিষ্কাম কর্ম, লোকহিত ও চিত্তশুদ্ধি বোঝায়, এ শিক্ষার জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্র বা মহাত্মা গান্ধীর কাছে ঋণী, ডিরোজিও-শিষ্যদের কাছে ঋণী নই। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের আগে ব্রাহ্মসমাজও স্পষ্ট করে বুঝিয়েছিলেন ধর্ম খাদ্য-পেয়ের ব্যাপার নয়, নীতিভক্তির ব্যাপার। ব্রাহ্মসমাজের কথা হিন্দুরা শোনেনি—বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কথা শুনেছিল। তাই বলে ব্রাহ্মদের কৃতিত্বকেও খাটো করা যায় না। আধুনিক যুগে তাঁরাই সকলের আগে প্রচলিত হিন্দুধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ধর্মের পথ দেখিয়েছিলেন। ডিরোজিয়ানরা যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ, ডিরোজিওর দুই প্রধান শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন; শিবচন্দ্র দেব ও রামতনু লাহিড়ী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোলে আশ্রয় পেয়েছিলেন; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় টিকিধারী হিন্দুতে পর্যবসিত হয়েছিলেন। যাঁদের যুক্তিবাদ এমন উদ্‌ভ্রান্ত, তাঁদের সম্বন্ধে 'বিদ্রোহী আত্মা', 'শৃঙ্খলভাঙা তারুণ্য' প্রভৃতি শব্দ শুনলে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেই লজ্জাবোধ হয়।

কিন্তু আজকালকার এই ডিরোজিও-ভক্তির পিছনে কতকগুলি অভিসন্ধি কাজ করছে বলে সন্দেহ হয়। সেই অভিসন্ধি বুঝতে পারলে এও বুঝতে অসুবিধা হবে না, ঐতিহাসিক সত্যকে আজকাল এমন বিকৃত করা হচ্ছে কেন। চোখ কান যাঁদের খোলা আছে তাঁরাই জানেন, আধুনিক নব্যবঙ্গেও মদগোমাংসের চল খুব বেড়েছে। আধুনিকদের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাইকেল বা কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো কোনো প্রতিভাশালী লোক আছেন কিনা জানি না। কিন্তু 'ইয়ং ক্যালকাটা' যে আধুনিক কালেও মদের ঘোরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে পদে-পদে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা ঠিক, এঁরা হরিশচন্দ্র বা মাইকেলের মতো অবিরত মদ্যপানের ফলভোগী হয়ে গোটা দেশের আপশোষের কারণ হন না। কিন্তু বিপরীতক্রমে মদ খাওয়ার জন্য কাউকে আজকাল আর উইলসনের হোটেলেও যেতে হয় না। নৈকষ্য বাঙালী পরিবারের নৈকষ্য বাঙালী যুবক তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একত্র মদ খেয়ে বাড়ির মধ্যে ধেই ধেই করে নাচছে, কলকাতা শহরে এমন দৃশ্য আজকাল মোটেই দুর্লভ নয়। আজকের হিন্দুসমাজের এমন ক্ষমতা নেই যে, অতিনিরীহ লোককেও মদ খাওয়ার জন্য সাজা দেয়। কাজেই মদ খেয়ে এখন আর বিপ্লব করা যায় না। কিন্তু 'শৃঙ্খলভাঙা তারুণ্যের' একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে সামান্যতম কাজকেও বৈপ্লবিক কাজ বলে প্রচার করা। এইটেই আধুনিক ডিরোজিও-ভক্তির একটা বড় কারণ।

আরেকটা কারণ এর চেয়ে গুরুতর। সকলেই জানেন, অতি-আধুনিক বাঙালী সমাজে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব খুব বেশি। সাধারণভাবে বলা যায়, গোটা শিক্ষিত ভারতই আজ ভাবধারার ব্যাপারে দুভাগ হয়ে গেছে। অনেকে কমিউনিস্ট ভাবধারার পক্ষপাতী হয়েছে, অনেকে সেকিউলারিস্ট ভাবধারার পক্ষপাতী হয়েছে—যদিও পশ্চিম বাঙলায় কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাবই বেশি মনে হয়। কমিউনিস্টরা নাস্তিক ও শ্রেণীহীন সমাজ চায়, সেকিউলারিস্টরা চায় না-হিন্দু না-মুসলমান সমাজ, যার মধ্যে আস্তিকতার ভাব বজায় থাকলেও, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়েই সেটা আবদ্ধ থাকবে। দুঃখের বিষয় এই দুই

সমাজের কোনোটাই আজো আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টরা মনে করেন, হিন্দুসমাজই তাঁদের মহাশত্রু, কারণ হিন্দুরাই ভারতে সংখ্যায় ভারী। এইজন্যই নব্যবঙ্গে আজ ডিরোজিও-ভক্তির এত প্রাবল্য। একথা ঠিক, ডিরোজিয়ানরা কমিউনিস্টও ছিলেন না, সেকিউলারিস্টও ছিলেন না। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় তাঁরাই হিন্দুসমাজকে সবচেয়ে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টরা বলতে চান: "আমরা আজ যা করছি সে কোনা উটকো বা নূতন ব্যাপার নয়—দেড়শো বছর আগে অনেক নামজাদা বাঙালীও তাই করেছিলেন। আমরাও ভুঁইফোড় নই—আমরা একটা যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ট্রাডিশনের ধারক-বাহক।"—এই যুক্তিতেই আজকের বাঙলায় ডিরোজিও-ভক্তির এত বাড়াবাড়ি।

॥ পাঁচ ॥

১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর মানসিক জাগরণে ডিরোজিয়ানদের স্থান কী? 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও পরের যুগের উদারপন্থী হিন্দুসমাজের সৃষ্টি—যদিও মাইকেলের মতো স্বধর্মত্যাগীর দ্বারাও ঐ জাগরণের গৌরববৃদ্ধি হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজ বা উদারপন্থী হিন্দুসমাজ কোনোটাই ডিরোজিয়ানদের প্রভাব স্বীকার করেনি। ব্রাহ্মসমাজ ডিরোজিয়ানদের পূর্বগামী, উদারপন্থী হিন্দুসমাজের সৃষ্টি ব্রাহ্ম-ভাবধারার প্রতিক্রিয়ায়। ডিরোজিয়ানরা ব্রাহ্মসমাজ ও উদারপন্থী হিন্দুসমাজের মধ্যবর্তী কালের একটা Interlude—বাঙলার জাগরণের স্থিরপ্রবাহে তাঁরা একটা জলবুদ্বুদ, যে বুদ্বুদ অল্প দিনের মধ্যেই ফেটে গিয়েছিল। যে তিনটি সূত্র বেঙ্গল রেনেসাঁসের মূল—(১) মনসা-শীতলা ঘটিত উপধর্মের বদলে গীতা-উপনিষদের ধর্মের অভ্যুত্থান, (২) সমাজের ধারা বজায় রেখে সমাজের সংস্কার এবং (৩) ইংরেজিচর্চার সহযোগী সংস্কৃতচর্চা—ডিরোজিয়ানদের ক্রিয়াকলাপে এই তিন সূত্রের একটিও স্পষ্ট হয়নি। অতিরিক্ত মদ্যপানের দ্বারা তাঁরা কতকগুলি প্রতিভাশালী ব্যক্তির অকালমৃত্যুর কারণ

হয়েছিলেন এবং হিন্দু রক্ষণশীলতাকে কিছুদিনের জন্য আরো বেশি উগ্র করে তুলেছিলেন—এর বেশি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব তাঁদের প্রাপ্য নয়।

॥ ছয় ॥

তবে এও মনে রাখতে হবে ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানদের প্রতি হিন্দুসমাজ অন্যায় করেছিল, প্রথম আঘাতটা তারাই করেছিল। কৃষ্ণমোহনের বন্ধুরা কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতিকালে তাঁর বাড়ীতে বসে গোরু খেয়ে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়িতে সেই গোরুর হাড় ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এটা নিশ্চয়ই অন্যায়, কিন্তু এর জন্য কৃষ্ণমোহনকে ঘরছাড়া করা আরো বেশী অন্যায়। এর চেয়েও বেশী অন্যায় হয়েছিল ডিরোজিওর বিরুদ্ধে। হিন্দু কলেজের হিন্দু কর্তৃপক্ষ প্রথমে ডিরোজিওকে অযোগ্য শিক্ষক বলে ছাড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা এতই অবিসংবাদিত ছিল যে সে চেষ্টা ধোপে টেঁকেনি। তখন তাঁরা ছলচাতুরী করে ডিরোজিওকে ছাড়িয়ে দেন—এটা অনেক বেশী অন্যায়। হিন্দুকলেজের তৎকালীন পরিদর্শক হোরেস হেম্যান উইলসন ডিরোজিওকে যে তিনটি প্রশ্ন করেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, ডিরোজিও ভাইবোনের বিয়ে সমর্থন করেন কিনা। যারা উইলসনকে এরকম একটা আজগবি প্রশ্ন করার প্ররোচনা দিয়েছিল তারাই সে যুগের হিন্দুসমাজ। অর্থাৎ ডিরোজিওকে ছলে বলে কৌশলে corruptor of youth রূপে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল। এদিক দিয়ে ডিরোজিওর পদচ্যুতি আমাদের সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য ডিরোজিও বাইশ বছরের বালক ছিলেন মাত্র—সক্রেটিসের জ্ঞান বা চিন্তাশক্তির মৌলিকতা তাঁর মধ্যে ছিল না—ও বয়সে সেটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কতকগুলি আদর্শবাদী তরুণ-যুবকের মনে তিনি যে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন তার সঙ্গে সক্রেটিসের প্রভাবের তুলনা অন্যায় নয়। বাইশ বছরের যুবকের এ কীর্তি অবিস্মরণীয়।

তার চেয়ে বড় কথা, ডিরোজিওর যে শিষ্যরা গুরুর মৃত্যুর পরে বহু বৎসর জীবিত থেকেও মদ-গোমাংস-বিরোধী হিন্দুসংস্কারের পরিবর্তে মদ-গোমাংস-

লোলুপ অহিন্দু সংস্কারের প্রবর্তক রূপেই খ্যাতিলাভ করেন ডিরোজিওর বাইশ বছরী অপরিণত মনও তাঁদের মতো সংস্কারান্ধ ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব জিজ্ঞাসা করলে ডিরোজিও বলেন: "আমি আজও চরম সত্য পাইনি; আমার অনুসন্ধান আজও শেষ হয়নি"। এরকম উদার বাক্য কোনো ডিরোজিও-শিষ্যের মুখে শোনা যায়নি। যাঁরা ধেড়ে বয়সে 'গোরু খাবি' 'গোরু খাবি' বলে মুটে-মজুরের উপর উপদ্রব করতেন এবং "I hate everything connected to Hindooism from the bottom of my soul" বলে বাহবা কুড়োতেন তাঁরা হয়তো বয়সের গুণে গুরুকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাইশ বছর বয়সী গুরুর উদার বুদ্ধি তাঁরা সত্তর বছর বয়সেও পাননি। এইজন্য মনে করি, ডিরোজিও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আদর্শ ছাত্র পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। শিক্ষকের কাজ ছাত্রকে মতবাদ শেখানো নয়,—ছাত্রমনকে জাগিয়ে তোলা। ডিরোজিও ঠিক তাই করেছিলেন। বার্ণার্ড শ বলেছেন, He who can, does; he who cannot, teaches। ডিরোজিও 'ডুয়ার' ছিলেন না, কিন্তু 'টীচার' হিসাবে তাঁর জুড়ি ছিল না। বার্ণার্ড শ না বললেও আমরা জানি সংসারে 'ডুয়ারে'র চেয়ে 'টীচারে'র দাম কম নয়। দুঃখের বিষয়, ডিরোজিওর শিষ্যরা 'ডুয়ার' হতে গিয়েছিলেন এইটেই তাঁর জীবনের ট্রাজিডি। আরো দুঃখের বিষয় সেই ট্রাজিডির পঞ্চমাঙ্কের উপর আজও যবনিকাপাত হয়নি। আজ যাঁরা ডিরোজিওর ঐতিহাসিক 'এপিটাফ' লিখতে বসেছেন, তাঁরা সেই ট্রাজিডি আরও বাড়িয়ে তুলছেন—শিষ্যদের মদমাংসের উপদ্রবকে 'চিন্তাবিপ্লব' নাম দিয়ে অকালমৃত, প্রতিভাশালী গুরুর স্মৃতিকে বুদ্ধিমান লোকের চোখে হাস্যাস্পদ করে তুলছেন।

বিদ্যাসাগর কি 'আধুনিক' ছিলেন ?

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আজকাল যে সব লেখা ছাপা হচ্ছে, সেগুলিতে সচরাচর একটা কথার উপর জোর দেবার চেষ্টা দেখা যায়। অধিকাংশ লেখকের বক্তব্য, বিদ্যাসাগর 'আধুনিক' ছিলেন, এবং এই বিংশ শতাব্দীব শেষভাগে গ্রাহ্য যে অর্থ সে অর্থেই 'আধুনিক' ছিলেন।

এ সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য : 'আধুনিক' কথাটা ভারী গোলমেলে। এর দ্বারা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচারক বোঝাতে পারে, ম্যাক্সি বা মিনি স্কার্টেব বেচনদার বোঝাতে পারে, বিবাহ-হীন কামসেবার সমর্থক বোঝাতে পারে, হিপিদের জীবন-যাত্রাব অনুকারক বোঝাতে পাবে, এমন কি 'ইণ্টাবন্যাশান্যাল কৃষ্ণ-কনসাসনেস'-এব বিজ্ঞাপনদাতা বোঝাতে পারে। এগুলির প্রত্যেকটাই বিংশ শতাব্দীর 'আধুনিকতা'ব দৃষ্টান্ত। আমরা বেশ বুঝতে পারি, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এসব দৃষ্টান্তের কোনোটাই খাটে না। কিন্তু 'আধুনিক'-এব মতো এমন একটা সস্তা শ্লোগান ব্যবহাব করলে বিদ্যাসাগরেব মাহাত্ম্য যে সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায় না, এ জিনিসটা অনেকেই বোঝেন না,—তাঁদের জন্যেই এগুলোর উল্লেখ। আমাদের দেশে 'আধুনিক' কালে চিন্তাশক্তির যে দৈন্য দেখা দিয়েছে, তাব একটা বড লক্ষণ হচ্ছে 'আধুনিক', 'প্রগতিশীল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে আমরা সেই দৈন্যকে চাপা দেবার চেষ্টা করি। 'প্রগতিশীল' শব্দটাকে আমি জুতোর দোকান এবং চুলকাটার সেলুনের বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার হতে দেখেছি—কাজেই এ শব্দের দ্বারা বিদ্যাসাগরেব মাহাত্ম্য বাড়ে না, অন্ততঃ কোনো বুদ্ধিমান লোকের কাছে বাড়ে না।

সে যাই হোক, বিদ্যাসাগর কোনো অর্থেই 'আধুনিক' ছিলেন কি না সে কথা ক্রমশ বিচার্য। এখনকার মতো জিজ্ঞাস্য এই যে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যে গুণগুলি আরোপ করে আজকাল তাঁকে 'আধুনিক' বলে দেখানো হচ্ছে, সেগুলো তাঁব

সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা। যাঁরা বিদ্যাসাগরকে 'আধুনিক' নাম দিয়ে খাতির করেন, তাঁদের কথার ভাবে স্পষ্টই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তাঁরা (১) নাস্তিকতা, (২) সমাজবিদ্রোহ বা সমাজ-বিপ্লব এবং (৩) হিন্দুসমাজের যা কিছু রীতিনীতি প্রাচীন তারই প্রতি অনাস্থা—এই তিনটি মত বা ভাবের পক্ষ সমর্থন করাতে চান। আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেই আজকাল মনে করেন : আমাদের পক্ষে (অর্থাৎ এ দেশের হিন্দু-মুসলমান সাধারণের পক্ষে) এই তিনটি মতই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়—বিদ্যাসাগরের সর্বজনশ্রদ্ধেয় চরিত্রের দৃষ্টান্তে তাঁরা এই মত বা গুণগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করতে চান। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তে এ সব মত বা গুণের গৌরব বাড়ানো যায় কিনা, সে কথা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়।

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন ?

বিদ্যাসাগর যে নাস্তিক ছিলেন এ-কথার সপক্ষে কী কী প্রমাণ দেওয়া হয়েছে ? সদর্থক প্রমাণ প্রায় কিছুই দেওয়া হয়নি বললেই চলে। পূর্বোক্ত লেখকের দল শুধু এইটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনে আস্তিকতার প্রমাণ অত্যন্ত নগণ্য। বিদ্যাসাগর চিঠির উপরে "শ্রীহরি সহায়" প্রভৃতি পাঠ লিখতেন ; শ্রাদ্ধ, বিবাহ, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতিতে ধর্মসম্মত আচার মেনে চলতেন—এ সবের মধ্যে তাঁর আন্তরিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় নিহিত ছিল না। এই মতটাকে একটু সম্প্রসারিত করলে কী দাঁড়ায়, পূর্বোক্ত লেখকরা বোধ হয় সে জিনিসটা ভেবে দেখেননি। নিজেদের অজান্তে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে এমন সব ভণ্ডের দলে ঢুকিয়েছেন, ধর্ম যাদের কাছে একটা পেশা মাত্র,—যারা ধর্মের নামে চরম অধর্মাচরণ করে দেশের সবনাশ করেছে ও করছে। বিদ্যাসাগর কি এমন সব লোকের মতো ভণ্ডামি করেই দেশের ভালো করতে চেয়েছিলেন ? ভণ্ডের দ্বারা দেশের মঙ্গল কি কখনো সম্ভব ?

এই লেখকের দল বলছেন, বিদ্যাসাগর যদি আস্তিক হতেন, তবে মন্দিরে যেতেন না কেন ? ধর্ম নিয়ে হাসি-তামাসা করতেন কেন ? ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্ন

এড়াবার জন্য 'যমালয়ে গিয়ে পরের জন্য বেত খেতে পারব না'—এমন সব কথা বলতেন কেন? শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে ভাবের কথা একটিও বললেন না কেন? সেণ্ট লরেন্স জাহাজডুবিতে শত শত যাত্রীর মৃত্যু তাঁকে ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ করার প্ররোচনা দিল কেন? কাশীর ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি নিজের বাপ-মাকে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা বলে পরিচয় দিলেন কেন?

এসব প্রশ্ন অত্যন্ত হাস্যকর এবং যাঁরা এসব প্রশ্ন করেন তাঁরা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বুঝতে পারতেন এগুলিতে নাস্তিকতার প্রমাণ অতি নগণ্য, বরং কিছু কিছু আস্তিকতার ইঙ্গিতই বিদ্যমান। প্রথমেই বলতে হয়, আস্তিক হবার জন্য মন্দিরে যাওয়া অবশ্য-কর্তব্য একথা তাঁরা কোন্ শাস্ত্রে পেলেন? অন্ততঃ উপনিষদে ও গীতায় মন্দিরে যাওয়ার কর্তব্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি;—অর্থাৎ যে শাস্ত্রকে হিন্দুরা চিরকাল শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ভেবে এসেছে, সে শাস্ত্র মন্দির-যাত্রা সম্বন্ধে নীরব। আধুনিক যুগেও যাঁরা শ্রেষ্ঠ হিন্দু নামে পরিচিত, যাঁদের আস্তিকতা সম্বন্ধে তর্ক চলে না, তাঁরা কেউই মন্দিরে যাওয়া নিয়ে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা করেননি। রামকৃষ্ণ করেননি (যদিও তিনি অনেকের কাছে অবতার বলেই গণ্য হয়েছেন); বিবেকানন্দ করেননি (যদিও তিনি সারাজীবন হিন্দুশাস্ত্রই প্রচার করেছিলেন); মহাত্মা গান্ধী করেননি (যদিও তাঁর নিজের ধর্মই তাঁকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছিল)। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই লিখেছিলেন: **'A man may have never visited a temple in his life time and yet remain a Hindu'.** অবশ্য এঁরা কেউই মন্দিরে না-যাওয়া নিয়ে উত্তেজনা করতেও রাজি ছিলেন না, কিন্তু মন্দিরে না গেলে ধর্ম হয় না এমন অদ্ভুত ও অহিন্দু মত তাঁরা কখনও প্রচার করেননি। কাজেই এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আচরণকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আস্তিকদের চেয়ে খুব বেশী আলাদা ভাববার কারণ নেই। তাছাড়া একথা বলা বাহুল্য যে জীবনচরিতে বিদ্যাসাগরের মন্দির-যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য না থাকলেও প্রমাণিত হয় না যে তিনি কখনও মন্দিরে যেতেন না, চরিতলেখকেরা মন্দিরে যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করবেন, একথা ভাবাই ভুল।

বিদ্যাসাগর ধর্ম নিয়ে হাসি-তামাসা করতেন? পরম ধার্মিক লোকেরাও তা করে থাকেন। বিবেকানন্দ নিজের গুরুকে নিয়েও পরিহাস করতেন। কথামৃতে আছে: বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পরেই তাঁর গুরুর দশা-পাওয়া অবস্থার নকল করে গুরুভাইদের সঙ্গে রঙ্গরস করছেন। যাঁরা এই রঙ্গরসের যুক্তি দিয়ে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা প্রমাণ করতে চান, তাঁদের নাস্তিকতা যতই খাঁটি হোক রসজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। একজন লেখক জানিয়েছেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর বাপকে নাকি বিদ্যাসাগর কাশীবাস করার সময় গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঐ লেখকের মতে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্বন্ধে এটা একটা 'প্রমাণ'। এ সম্বন্ধে কেবল এটুকু বললেই চলবে যে, ঐ লেখক নাস্তিক্যের ধনে যতই ধনবান হোন, তাঁর রসজ্ঞানের ভাণ্ডার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার নয়। আমাদের দেশের ধর্মসাধনায় এবং ধর্মবিশ্বাসীদের জীবন-যাত্রায় রঙ্গরসের উপকরণ এত বেশি আছে যে, বিদ্যাসাগরের মতো রঙ্গপ্রিয় লোক তা নিয়ে তামাসা না করলেই তাঁর সম্বন্ধে চিন্তার কারণ ঘটত। এই রঙ্গপ্রিয়তার জন্যেই তিনি পারলৌকিক বিষয় নিয়ে পরের জন্য (যমরাজের) বেত খেতে নারাজ ছিলেন। এই রঙ্গপ্রিয়তার জন্যই ভাবের কথা নিয়ে আলোচনা করাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। এক্ষেত্রে আরো মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগরের যুগ একই সঙ্গে ধর্ম-ভাবুকতার যুগ এবং ধর্মবাতিকের যুগ। এই বাতিকগ্রস্ততার পরিবেশে বাস করে ধার্মিক লোকের মধ্যে ভাবুকতা এবং উদ্দীপনার ভাব থাকাই যথেষ্ট ছিল না, এমন লোকেরও প্রয়োজন ছিল যাঁরা বাতিকগ্রস্তের ভিড় ঠেকিয়ে রাখবার জন্যই ভাবুকতার প্রশ্রয় দেবেন না। বিদ্যাসাগর যে তেমন আস্তিক ছিলেন না, এ কথাই বা কে বলতে পারে? রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' একটি লোকের কথা লিখেছেন, সে প্রায়ই এসে বলত: দেখ, দেখ, ঈশ্বর আমার চোখের সামনে বিজ্ বিজ্ করছেন। যে যুগে চোখের সামনে বিজ্-বিজ্-করা ভগবানেরও দর্শন মিলত, সে যুগে এমন আস্তিকেরও প্রয়োজন ছিল যাঁরা ধর্ম নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করতে সঙ্কোচ বোধ করবেন। বিদ্যাসাগর যে তেমন আস্তিক ছিলেন না, এ কথার কী প্রমাণ

আছে? "আমার বাবা-মা-ই বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা"—এ কথাটাও বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে নাস্তিকতার প্রমাণ নয়, বরং তার বিপরীত। হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে যাঁর অ-আ-ক-খ'র জ্ঞান আছে, তিনিই জানেন, হিন্দু আস্তিকতার এক প্রাথমিক সোপান হচ্ছে বাপ-মায়ের প্রতি ভক্তি। মনু বাপ-মাকে বলেছেন 'প্রত্যক্ষ দেবতা'। শ্রাদ্ধের সুবিদিত মন্ত্রেও আছে: পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। সে মন্ত্রে এমনও বলা হয়েছে যে, পিতার প্রীতিতেই সর্বদেবতার প্রীতি হয়। কাজেই এ দৃষ্টান্তে যিনি বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণ করতে চান তাঁকে আগে দেখাতে হবে, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা সর্বদেবতার দলছাড়া। এও লক্ষ করতে হবে, আজকাল আমাদের দেশে নাস্তিকতার যে প্রসার ঘটেছে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিও দুর্লভ হয়েছে। যাঁদের জীবন থেকে কেবল ভগবদ্ভক্তি নয়, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিও বিদায় নিয়েছে, তাঁরাই বিদ্যাসাগরের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিকে নাস্তিকতার লক্ষণ বলে প্রমাণ করতে চান, এমন সন্দেহের কারণ আছে।

জাহাজডুবিতে শত শত যাত্রীর অপঘাত মৃত্যু নিয়ে বিদ্যাসাগরের যে অভিমান সেটাও নাস্তিক মতের সপক্ষে যায় না। নাস্তিক কখনও ভগবানের নিষ্ঠুরতা নিয়ে নালিশ করে না, কারণ সে ভগবানের অস্তিত্বই মানে না। পাথরবাটি কেন সোনা দেয় না—কোনো বুদ্ধিমান লোক এমনধারা নালিশ করে না; কিন্তু প্রেমময় কেন প্রেম দেন না—এ নালিশ বুদ্ধিমান্‌কেও সাজে, কেননা সে প্রেমময়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। রামপ্রসাদও এ রকম নালিশ করতেন—কালীকে তিনি 'সর্বনাশী' ইত্যাদি নাম দিয়ে বকাবকি করতেন।

একজন লেখক একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন। বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' বইটিতে ভগবান সম্বন্ধে একটা কথা আছে;—এই লেখক বলেছেন, সেটাও তাঁর আস্তিকতার প্রমাণ নয়। এঁর মতে, ভগবানের কথা না থাকলে সে যুগের কোনো পাঠ্য বই শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন পেত না, কাজেই বিদ্যাসাগর এই বাক্যটা লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন, এই 'বোধোদয়ের' বাক্যটার পিছনে একটা

রহস্য আছে। শোনা যায়, প্রথম সংস্করণে এ বাক্যটা ছিল না, পরে দুয়েক জন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর এটা ঢুকিয়ে দেন। কাজেই আমাদের আলোচ্য লেখক যদি একথা বলতেন যে, বিদ্যাসাগর এটা বন্ধুদের মন রাখার জন্য লিখেছিলেন—এর মধ্যে তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাস ব্যক্ত হয়নি,—তাহলে যুক্তিটার মধ্যে কিছু জোর থাকত। কিন্তু ইনি স্পষ্টই বলেছেন: তা নয়, শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন পাওয়ার জন্যই বিদ্যাসাগর এমন একটা বাক্য লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইনি জানেন না, ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা নিয়ে আজকাল যে হৈ-চৈ করা হয়, সেটা আমাদের দেশে নূতন নয়। ইংরেজরা এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করেন, এদেশের লোক যাতে খ্রীষ্টানির ভয়ে বিগড়ে না যায়, তার জন্য শিক্ষাকে আগে ভাগেই ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধর্মহীন করার ব্যবস্থা করতে হবে,—সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলবে না। এইটি ছিল ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মূল নীতি। এ নীতি অনুসারে 'বোধোদয়' বা অন্য কোনো পাঠ্য পুস্তকে ভগবান্ সম্বন্ধে কোনো বাক্য না থাকলেই শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন সুলভ হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের আলোচ্য লেখক 'বোধোদয়' সম্বন্ধে যে কথা বলছেন সেটা অসত্য বা মিথ্যা। বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণ করবার জন্য ইনি এতই ব্যস্ত হয়েছেন যে, শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে এমন একটা কথা বানিয়ে বলতেও কুণ্ঠিত হননি। এর পিছনে যে দলগত বা মতগত স্বার্থের উত্তেজনা আছে, বিদ্যাসাগরকে শিখণ্ডী খাড়া করে যে স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা আছে, তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যেতে পারত। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলেই ক্ষান্ত হব। বিদ্যাসাগরের ভাষা অনুসরণ করে বলব: তাঁকে নাস্তিক প্রমাণ করবার জন্য ইংরেজ আমলের শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে এমন একটা আষাঢ়ে গল্প খাড়া করা "ভদ্রের কর্ম হয় নাই।"

বিদ্যাসাগর কি সমাজ-বিপ্লবী ছিলেন ?

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতার প্রমাণ অতি নগণ্য। যে যুক্তিতে যে সব ঘটনাকে নাস্তিকতার প্রমাণ বলে প্রচার করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক জোরালো যুক্তিতে সেই সব ঘটনাকেই আস্তিকতার প্রমাণ বলা যায়। অবশ্য বিদ্যাসাগর যে আস্তিক ছিলেন, "শ্রীহরি সহায়" প্রভৃতি পাঠ লেখাই তার চরম প্রমাণ। যাঁরা বলেন, সমাজসংস্কারে যাতে বাধা না আসে, তার জন্যই বিদ্যাসাগর এ সব পাঠ লিখতেন তাঁদের কথা অশ্রদ্ধেয়। আগেই বলেছি, এ কথা বিদ্যাসাগরকে ভণ্ড বলার সামিল। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও 'শ্রীহরি সহায়ের' দ্বারা সমাজসংস্কারেব সুবিধা হবে এটা অত্যন্ত নির্বোধের মতো কথা। চিঠির উপরে ভগবানের নাম লেখা নিয়ে হিন্দুসমাজে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কোনো কালেই ছিল না। কাজেই—চিঠিতে বিদ্যাসাগর 'শ্রীহরি সহায়' লিখলেন কিনা, এ নিয়ে হিন্দুসমাজে হৈ হৈ ব্যাপার এবং রৈ রৈ কাণ্ড হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; অতএব এটাকে বিদ্যাসাগরের আস্তিক্যের প্রমাণ বলে মেনে নেওয়াই সঙ্গত। এইবার দেখা যাক, বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজেব প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথার সপক্ষেই বা কতটুকু প্রমাণ আছে।

পূর্বোক্ত লেখকের দল বলছেন: বহুবিবাহের নিবারণ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজের সর্ববিধ প্রতিকূলতা এমন কি প্রাণহানির সম্ভাবনা পর্যন্ত ডেকে এনেছিলেন; এর দ্বারাই তাঁর 'বিদ্রোহী' বা 'বিপ্লবী' চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, এবং বিপরীতক্রমে এও বোঝা গেছে যে প্রাচীন হিন্দু-সমাজের স্বরূপ অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। পূর্বোক্ত লেখকের দল এমনও ইঙ্গিত করেছেন, বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব লোপ করে একটা ধর্মহীন সমাজ বা রাষ্ট্র স্থাপনা করাই আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুতর কাজ।

আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুতর কাজ কোন্‌টি, তা নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব কথায় বোঝা যায়, যাঁরা বিদ্যাসাগরকে 'আধুনিক' প্রমাণ করতে চান তাঁরা একটা উদ্দেশ্যসাধনের উত্তেজনায় চালিত হচ্ছেন,

খামকা বিদ্যাসাগরের গৌরব বাড়ানো তাঁদের লক্ষ্য নয়। তাঁদের সেই উদ্দেশ্যের সাধুতা-অসাধুতা নিয়ে এখানে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তাদের সেই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা হবে কিনা সন্দেহ।

কেননা সকলেই জানেন, এবং পূর্বোক্ত লেখকের দলও জানেন, বিদ্যাসাগর তাঁর সমাজসংস্কারের কাজে শাস্ত্রের সম্মতি খুঁজেছিলেন। পূর্বোক্ত লেখকেরা এই সম্মতি খোঁজার কাজটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন, সে-কথা আলোচনা করার আগে এ কাজের সহজবোধ্য তাৎপর্যটুকু আমাদের তলিয়ে বোঝা উচিত। শাস্ত্র যে সমাজের নিয়ামক, সে সমাজ যদি শাস্ত্রবিরোধী দেশাচারে চলে তবেই তার বিনাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ অবস্থায় যিনি সমাজকে শাস্ত্রপথে চালাতে চান, তাঁকে সমাজের 'নাশক' না বলে 'রক্ষক' বলাই যুক্তিযুক্ত, এবং এইটেই বিদ্যাসাগরের কাজের সহজবোধ্য তাৎপর্য। এ তাৎপর্য নূতন নয়, বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক লোকেরাও এটা জানতেন। আমরা সবাই জানি, বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধাচারীর সংখ্যা অনেক বেশি হলেও, কিছু নিষ্ঠাবান পণ্ডিত তাঁর সমর্থক ছিলেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন, বিদ্যাসাগরই সমাজের রক্ষক, অন্যেরা শাস্ত্র-বিরোধী দেশাচারের উন্মার্গগামী পথিক মাত্র। যাঁরা বলেন, বিদ্যাসাগর 'সমাজ-বিদ্রোহী' বলেই তাঁর গৌরব, তাঁদের কথা মানতে গেলে সেই সঙ্গে এও বলতে হয় যে ন্যায়রত্ন, শিরোমণি প্রভৃতি রক্ষণশীল পণ্ডিতেরাও হিন্দুসমাজ-সংহারকের ভূমিকায় নেমেছিলেন, কিন্তু এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?

পূর্বোক্ত লেখকের দল বলেন, শাস্ত্র-সম্মতি খোঁজাটা বিদ্যাসাগরের একটা কৌশল মাত্র, তাঁর সামাজিক যুদ্ধের একটা স্ট্রাটেজি মাত্র। অবশ্য একথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রতারক বলারই সামিল, কিন্তু সে-কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। না হয়, মেনেই নিলাম যে, কৌশল আর প্রতারণা এক জিনিস নয়,—কৌশল অনেক বড় জিনিস। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ খাড়া করতে গেলে

তাঁর সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমাজসংস্কারের কৌশলটুকুও গ্রহণ করতে হয়। যদি বল : কৌশলের সুবিধা এই যে, প্রয়োজনবোধে এর অদল বদল করা যায়, তাহলে বিদ্যাসাগরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ খাড়া করা যায় না।

কেননা প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর সারাজীবন এই স্ট্রাটেজির কোনো বদল করেননি—বরং হিতকর সমাজসংস্কার যদি শাস্ত্রের অনুগামী না হত, তাহলে শেষ পর্যন্ত তিনি তার বিরোধিতাই করতেন। ('সহবাস-সম্মতির' আইনে তিনি বাধা দিয়েছিলেন, তার কারণ এ আইন শাস্ত্রসম্মত ছিল না।) কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, বিদ্যাসাগর এই শাস্ত্রানুগামিতার কৌশলকে একটা ন্যায়ধর্মবৃত্তি বা Conscience-এর ব্যাপার হিসাবে দেখতেন—কাজেই 'কৌশল' শব্দটা দিয়ে তাঁ মনের ভাবটা একেবারেই প্রকাশ পায় না। বিধবাবিবাহের মতো 'জীবনের সর্ব-প্রধান সৎকর্ম'কেও তিনি বাপের অনুমতিসাপেক্ষ মনে করতেন এবং ঠাকুরদাসের মত না পেলে তিনি এ ব্যাপারে পিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বাপ-মাকে বলেছিলেন : "আমি এ ব্যাপারে শাস্ত্রের সম্মতি পেয়েছি, এখন আপনারা আমায় অনুমতি দিন"। বিদ্যাসাগর বাপ-মাকেও 'ভুজং-ভাজং' দিয়ে ভুলিয়েছিলেন, অতি-আধুনিকতাবাদীরাও বোধহয় তাঁকে অতটা 'আধুনিক' বলবেন না। তা ছাড়াও, শাস্ত্রসম্মতির ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আন্তরিকতার আরো অজস্র প্রমাণ আছে, কিন্তু এই একটা প্রমাণেই বোঝা যাবে,—তাঁর জীবনে সমাজসংস্কারের যে স্থান, সমাজসংস্কারের 'কৌশলের'ও সেই স্থান ;—একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে গ্রহণ করা যায় না, অন্ততঃ সেক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ খাড়া করা যায় না।

বিদ্যাসাগর কি প্রাচীন রীতিনীতির বিদ্বেষ্টা ছিলেন ?

বিদ্যাসাগর যে প্রাচীন রীতিনীতির বিদ্বেষ্টা ছিলেন না এ নিয়ে বোধহয় প্রচুর পরিমাণ বাক্যব্যয়ের দরকার নেই। চটিজুতা আর ধুতি-চাদরের প্রতি তাঁর আসক্তি নিয়ে এত কথা বলা হয়েছে যে আর বলতে গেলে কারোই ভাল লাগবে

না। কিন্তু আরেকটা ঘটনা একটু কম প্রচলিত—এখানে সেইটের একটু উল্লেখ করা যাক। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন তাঁর (এবং বিদ্যাসাগরের) ঠাকুমা একটা অশথ গাছ লাগিয়েছিলেন, গ্রামের এক ক্ষমতাশালী মামলাবাজ লোক গাছটাকে কেটে ফেলার চেষ্টা করে। বিদ্যাসাগরের নির্দেশমতো শম্ভুচন্দ্র তাতে বাধা দেন, কিন্তু শত্রুতার ভয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে গিয়ে খবর দেন: "ঠাকুমার গাছটাকে আর বাঁচানো যাবে না।" বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে বলেন: "তুই মর্, আমি নিজে দেশে গিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেব, দরকার হলে প্রাণ দেব।" অবশ্য বিদ্যাসাগর-জীবনীর পাঠক মাত্রেই জানেন, তিনি কথায় কথায় প্রাণ দেবার ভয় দেখাতেন। কিন্তু এমন সামান্য ব্যাপারে প্রাণ দেওয়ার হুমকি তাঁর মুখ থেকে শুনলেও হাসি পায়। আসলে, ব্যাপারটার অসামান্যতা এই যে, অশথ গাছ লাগানো প্রাচীন হিন্দুসমাজের দানধর্মের একটা রীতি। সে যুগে যারা বিশেষ কিছু দেবার ক্ষমতা রাখত না, তারাও একটা বটগাছ লাগিয়ে পথিককে ছায়া দিতে চাইত। বিদ্যাসাগরের অতিদরিদ্র, লোকান্তরিতা পিতামহীও এই প্রাচীনধারার অনুসরণ করেছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর, এমন একটা ব্যাপারেও, পিতামহীর পুণ্য চেষ্টাকে প্রাণত্যাগের দ্বারা রক্ষা করার যোগ্য ভেবেছিলেন। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এ ঘটনার ভিতর তাঁর মনের যে তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে, তার কাছে চটিজুতার ব্যাপারটাও অতি সামান্য।

বিদ্যাসাগর ও উনবিংশ শতাব্দী

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কিনা, সমাজবিদ্রোহী ছিলেন কিনা, প্রাচীন রীতিনীতির বিদ্বেষ্টা ছিলেন কিনা—তাঁর জীবনী থেকে এ সব প্রশ্নের কী উত্তর পাওয়া যায় সেকথা আমরা দেখলাম। এখন দেখা যাক, আমাদের ১৯শ শতাব্দীর জাগরণের এক শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে তাঁর ভূমিকা কী ছিল ? তিনি কি ১৯শ শতাব্দীর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন ? তিনি কি সে যুগের ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম স্বরূপ বিংশ শতাব্দীর দিকে অভিমুখ ছিলেন ?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে হয় ১৯শ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা কী ?

এ-কথার উত্তর : (১) আস্তিকতার সহযোগী মানবসেবা এবং (২) সমাজধারা রক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কার। কিন্তু এই দুটো মত ও পথ কেবল বিদ্যাসাগরের একার নয়, সে-যুগের প্রত্যেকটি মনীষীর। যাঁরা বিদ্যাসাগরকে 'আধুনিক' প্রমাণ করতে চান, তাঁরা এই দুই মত ও পথের 'মানবসেবা' এবং 'সমাজসংস্কার' অংশটাতেই জোর দেন—'আস্তিকতা' ও 'সমাজধারা রক্ষার' দিকটা এড়িয়ে যেতে চান। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না বিদ্যাসাগরের জীবনে আস্তিকতার চেয়ে 'মানবসেবার' দিকটিই বড়। তিনি আস্তিক ছিলেন কিন্তু রামমোহন বা বিবেকানন্দের মতো আস্তিকতার প্রচারে তাঁর জীবন সমর্পিত হয়নি। চিঠির উপরে তিনি যে 'শ্রীহরি সহায়' প্রভৃতি পাঠ লিখতেন তার দ্বারা কোনো ধর্মপিপাসুর পিপাসা মিটবে না। কাজেই যাঁরা বলেন, বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদকে তাঁর আস্তিকতা থেকে আলাদা করা যায় তাঁদের মতের ভিতর যৎকিঞ্চিৎ সত্য থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁর সমাজসংস্কারকে কিছুতেই তাঁর 'শাস্ত্রানুগামিতা' থেকে আলাদা করা যায় না। শাস্ত্রানুগামিতার মধ্যে যে সমাজধারা রক্ষার চেষ্টা বিদ্যমান থাকে, বিদ্যাসাগরের জীবনে সে চেষ্টা তাঁর সংস্কার চেষ্টার মতই তীব্র ও আন্তরিক—দুটো একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এটুকু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা থেকেই পাই। কিন্তু যখন আমরা তাঁকে ১৯শ শতাব্দীর জাগরণের সন্তানরূপে দেখি, তখন দেখতে পাই তাঁর মানবসেবাকেও তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, কোনক্রমেই বলা চলে না যে, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত থেকে একালের 'নাস্তিক মানবতাবাদ' বা হিউম্যানিজম্-এর কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়।

যাঁরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক প্রমাণ করতে চান তাঁরা এই 'হিউম্যানিজ্‌ম' তত্ত্বটার উপরে খুব বেশি জোর দেন। তাঁরা বলেন, বিদ্যাসাগর 'হিউম্যানিস্ট'।

কিন্তু মুশকিল এই যে, বিদ্যাসাগরের যুগে আমাদের দেশে 'হিউম্যানিজ্‌ম' কথাটার চলনই হয়নি, কাজেই তাঁর মানবসেবা থেকে নাস্তিক মানবতাবাদের কোনো সমর্থন খুঁজে পাবার আশা দুরাশা। আমাদের ১৯শ শতাব্দীর জাগরণে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম মনীষী যাঁর রচনায় 'হিউম্যানিজ্‌ম' সম্বন্ধে কৌতূহল দেখা যায়, কিন্তু তিনিও এ মতবাদকে আস্তিকতার সঙ্গে না মিলিয়ে গ্রহণ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বের' বিষয়বস্তু হ'ল এই যে, পাশ্চাত্ত্যের নাস্তিক মানবতাবাদ যতটুকু নাস্তিক ততটুকুই অসম্পূর্ণ, হিন্দু আস্তিক্যের মধ্যেই এ-মতের চরিতার্থতা। বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যাতেও ঈশ্বরলাভের জন্যই মানবসেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজে মানবসেবাকে বলা হ'ত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন। ব্রাহ্মরা নাস্তিক মানবতাবাদের প্রতি আস্তিকের আংশিক অনুরাগও সহ্য করতে পারতেন না। ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু কোঁতীয় হিউম্যানিজ্‌মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতিত্ব দেখে তাঁকে 'নাস্তিক' ও 'জঘন্য কোমত মতাবলম্বী' বলে তিরস্কার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ যুগেরই সন্তান—তাঁর নিজের আস্তিকতা যত ক্ষীণই হোক, নাস্তিকতার দিকে ঘেঁষলে তিনিও রেহাই পেতেন না। তাঁর কর্মজীবনকে যদি সে-যুগের সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তাহলে এ অনুমানই সঙ্গত যে, আস্তিকতার দিকটা তিনি অপরের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন —দেশজোড়া ধর্মবিষয়ক দলাদলিতে যোগ না দিয়ে শাস্ত্রসম্মত মানবসেবার কাজগুলো নিয়েই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁকে যাঁরা নাস্তিক মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজমের প্রবর্তক বলেন, এবং কোঁতীয় হিউম্যানিজ্‌মেও সন্তুষ্ট না হয়ে কার্ল মার্ক্স প্রভৃতি মনীষীকে নিয়ে টানাটানি করেন তাঁদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না। [অবশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কোঁতীয় হিউম্যানিজ্‌মের দিকে ঝোঁক ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের, বিদ্যাসাগরের নয়।]

বিদ্যাসাগর হিউম্যানিস্ট নন। তিনি ১৯শ শতাব্দীরই সন্তান বটেন, কিন্তু তাঁর মানবসেবা কোন পাশ্চাত্ত্য মতের সঙ্গে জড়িত নয়—প্রাচীন হিন্দুসমাজের দানধর্মের সঙ্গেই তার যোগ। তবে ১৯শ শতাব্দীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এই যে,

প্রাচীন দানধর্মের মধ্যে যে পরকালের ভাবনা জড়িত ছিল, বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে সে ভাবনা অদৃশ্য বা অদৃশ্যপ্রায়। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও একথা সত্য—সেখানেও তিনি ১৯শ শতাব্দীর সন্তান, যদিও প্রাচীনতর যুগের সঙ্গেই তাঁর নৈকট্য। কোনক্রমেই তাঁকে 'সমাজবিপ্লবী' বলা যায় না। সংস্কারকদের মধ্যেও তিনি শাস্ত্রবাদী সংস্কারক অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী সংস্কারক।

বিদ্যাসাগরকে যাঁরা 'সমাজবিপ্লবী' বলে প্রচার করতে চান, তাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিকূলতার কথাটাতে খুব বেশি জোর দেন। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি ধবে নিয়ে বিস্তর গালমন্দ করেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে যৎকিঞ্চিৎ বিরোধ হয়েছিল তারই উপর ভিত্তি খাড়া করে বিদ্যাসাগরকে 'বিপ্লবী' এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে 'রি-এ্যাক্‌শনারি' নাম দিয়ে অতিমাত্রায় গরম হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঐ বিরোধ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে গরম হওয়ার মতো বিরোধ তাঁরা করেননি। বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর দুজনেই ছিলেন সমাজধারা রক্ষা করে সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, সমাজধারা রক্ষার উপায় সম্বন্ধেই দুজনের মতভেদ। সমাজবিপ্লবী বঙ্কিমও ছিলেন না বিদ্যাসাগরও ছিলেন না, প্রাচীনপন্থী বরং বিদ্যাসাগরই ছিলেন।

আসল ঘটনা এই। ১৯শ শতাব্দীর সমাজসংস্কারকে দুটো মোটা ভাগে ভাগ করা যায়ঃ এক, বৈবাহিক সমাজসংস্কার, দুই, সাধারণ সভ্যতা সংক্রান্ত সমাজসংস্কার। বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন যেসব সংস্কারে জোর দিয়েছিলেন সেগুলো বৈবাহিক সমাজসংস্কার, যথা, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ যেসব সংস্কারে জোর দিয়েছিলেন সেগুলো সাধারণ সভ্যতা সংক্রান্ত সংস্কার, যথা, সমুদ্রযাত্রা প্রবর্তন, ছুঁৎমার্গ-বর্জন ইত্যাদি। সার্থকতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সার্থকতা অনেক বেশিঃ বিদ্যাসাগরের ব্যর্থতা অপরিসীম। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আন্দোলন যেহেতু হিন্দু-সমাজে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল সেইজন্য তাঁকেই আমরা সমাজসংস্কারক বলে জানি; বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা প্রায় বিনা বাধায় সার্থক হয়েছিল

এবং এখনও হচ্ছে—সেইজন্য এঁদের আমরা সংস্কারক বলি না। অনেকে এমনকি 'রি-এ্যাক্শনারি' বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে : 'রি-এ্যাক্-শনারি' না হলে বৈবাহিক সমাজসংস্কারে বঙ্কিম বাধা দেবেন কেন ?

কিন্তু এ যুক্তিটা ভুল—সম্পূর্ণরূপেই ভুল। যে কারণে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবাদী—সেই কারণেই বঙ্কিম বৈবাহিক সমাজসংস্কারের বিরোধী। সে কারণ হচ্ছে সমাজ-ধারা রক্ষার ব্যাকুলতা। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম যুক্তিবাদকেই সমাদর করেছিলেন। কাজেই শাস্ত্রানুগামিতার দ্বারা যে সমাজধারা রক্ষার উপায়, সে উপায় তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ছিল। যিনি শাস্ত্রবাদী নন তাঁকে কাজে কাজেই সমাজধারারক্ষার অন্য উপায় দেখতে হবে—বঙ্কিমের কাছে সে উপায় ছিল জাতীয় ভাবের উপর জোর দেওয়া, বিবাহপ্রথার ক্ষেত্রে মেয়েদের তেজস্বিতার সঙ্গে অবিরোধী যে পাতিব্রত্য, সেই পাতিব্রত্যের উপর জোর দেওয়া এবং বিলাতী ঢঙে আমাদের বিবাহপ্রথার যে সংস্কার-চেষ্টা হচ্ছিল তাতে বাধা দেওয়া। তিনি দেখেছিলেন বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগামী সংস্কার বহুলোকের হাতে স্বজাতিবিদ্বেষের অস্ত্রমাত্র; তিনি দেখেছিলেন বিবাহপ্রথার সংস্কার অনেকের কাছে হিন্দুসমাজকে বিলাতী সমাজে রূপান্তরিত করবার অছিলা মাত্র। বঙ্কিমের মতে এটা সমাজধারা রক্ষার পথ নয়, জাতীয় জাগরণেরও পথ নয়।

আমি যে একটা মনগড়া কথা বলছি না, তার একটা প্রমাণ দেব। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শাস্ত্রবাদের' প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কখনো 'সমাজবিপ্লবী' বা 'সমাজবিদ্রোহী' বলে আক্রমণ করেননি। অথচ তেমন আক্রমণও তিনি করেছিলেন—সে আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন মালাবারি নামে এক পার্শী রিফর্মার। মালাবারি মহোদয় হিন্দুবিদ্বেষে এমনই জ্ঞানহারা হয়েছিলেন যে, সাহেব-সুবোর দরবারে গিয়ে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেননি। তিনি অকুণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, বাল্যবিবাহপরায়ণ হিন্দুরা আপামর নির্বিশেষে নাবালিকা পত্নীর উপর বলাৎকার করে। এই সব নালিশ নিয়ে তিনি ম্যাক্সমূলারের কাছে গিয়েও দরবার করেছিলেন। এই 'সহবাস

সম্মতি’র আন্দোলনে যখন গোটা ভারতভূমি আন্দোলিত, এই সময়ে হরি মাইতি নামে এক ব্যক্তি তার দশবছরের স্ত্রীর উপর বলাৎকার করে তার প্রাণনাশ করে এবং ঐ মামলার ইংরেজ জজ রায় দেন: হিন্দুসমাজের রীতিনীতির উপর যখন পীনাল কোডের হাত চলে না,:এবং বিবাহিত পত্নীর সঙ্গে সহবাসকে যখন বলাৎকার বলা যায় না, তখন হরি মাইতিকে বেকসুর খালাস দেওয়া গেল। অবশ্য বলা বাহুল্য, জজ ভুলে গিয়েছিলেন, হরি মাইতির উপর বলাৎকারের আইন না চলুক, হত্যার আইন চলতে বাধা নেই; তাছাড়া এরকম অপরাধ যদি হিন্দুসমাজেরই একচেটিয়া হত তাহলে ইংরেজী ভাষায় Pederasty নামে শব্দের অস্তিত্ব থাকত না। সে যাই হোক মালাবারি এবং তাঁর দল এই ঘটনাকে আশ্রয় করে হিন্দুসমাজের বৈবাহিক সমাজসংস্কারের জন্য আকাশ ফাটাতে শুরু করেন। বৈবাহিক সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাব নিয়ে ‘প্রোগ্রেসিভ রি-এ্যাক্‌শনারি’-ঘটিত গালমন্দ করার আগে এসব কথা মনে রাখা উচিত। এ সব ঘটনায় বোঝা যায়, বৈবাহিক সমাজসংস্কারকে বঙ্কিমচন্দ্র কেন সমাজধারা রক্ষার পরিপন্থী মনে করতেন। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র কখনো ‘প্রগতিবাদী’ ছিলেন না—কিন্তু গোটা হিন্দু জাতকে ‘নাবালিকা-ধর্ষকে’র অপবাদ না দিয়ে যাঁরা সমাজ সংস্কার করতে পারতেন না তিনি তাঁদেরকেই আক্রমণ করেছিলেন, সাধারণ সভ্যতা সংক্রান্ত সমাজসংস্কারে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।

সে যাই হোক সমাজধারা রক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উপায় শ্রেষ্ঠ কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপায় শ্রেষ্ঠ, এখানে সে আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে সে যুগের প্রত্যেক মনীষীই সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজধারা রক্ষার কথাও ভেবেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও একথা সত্য, যদিও ব্রাহ্ম নেতাদের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতের ঐক্য ছিল না। রামমোহন ছিলেন শাস্ত্রবাদী; শাস্ত্রানুগামিতার দ্বারাই তিনি সমাজধারা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রক্ষণশীল; রক্ষণশীলতার দ্বারাই তিনি সমাজধারা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যুক্তিবাদী—কিন্তু ইংরেজের আইনে সমাজসংস্কার না করে সেকাজ তিনি নতুন এক 'স্বদেশী সমাজের' হাতে দিতে চেয়েছিলেন। যেদিক দিয়েই দেখা যাক সে যুগের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তিই সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজধারা রক্ষার কথাও ভেবেছিলেন। বিদ্যাসাগর সে যুগের সন্তান, কাজেই তাঁকে সমাজবিপ্লবী বলার কোনো যুক্তি নেই।

উপসংহার ঃ

এ আলোচনা থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যায়? এ সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে বিদ্যাসাগর কেবল যে বিংশ শতাব্দীর বিচারে আধুনিক ছিলেন না তাই নয়, ১৯শ শতাব্দীর বিচারেও তিনি সবচেয়ে কম 'আধুনিক' ছিলেন। কথাটা শুনে কারো আঁৎকে ওঠার দরকার নেই, কেননা এ-কথার দ্বারা বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব খণ্ডিত হচ্ছে না। এ-কথার অর্থ এই যে, তাঁর আস্তিকতার ক্ষীণতা, তাঁর মানবসেবার বিশেষ রূপ, তাঁর সমাজসংস্কার—এই সব কয়েকটিই প্রাচীন হিন্দু ভাবধারা দিয়ে বেশি সহজে বোঝা যায়, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের 'আধুনিক' হিন্দু ভাবধারা দিয়েও সেটা স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। বিদ্যাসাগরের আস্তিক্য ক্ষীণ কেন? তাঁর মানবসেবা তাঁর আস্তিক্যের চেয়ে বড় কেন? তার কারণ বিদ্যাসাগরের আস্তিক্য স্মৃতিশাস্ত্রঘেঁষা। যে অর্থে চৈতন্যর আস্তিক্যের চেয়ে রঘুনন্দনের আস্তিক্য ক্ষীণ সে অর্থেই বিবেকানন্দের আস্তিক্যের চেয়ে বিদ্যাসাগরের আস্তিক্য ক্ষীণ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নব্য ভক্তিমার্গী এবং বিবেকানন্দের মতো নব্য বৈদান্তিক যে ভাবে তাঁদের মানবসেবার মতকে আস্তিক্যবুদ্ধির অনুগত করে আস্তিক্যকে প্রবল করে তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর তা করেননি। বিদ্যাসাগরের মানবসেবাও বিশেষ করে প্রাচীন হিন্দুঘেঁষা—এইজন্যই তার রূপ প্রধানতঃ দানধর্মের রূপ, এইজন্যই পিতামহীর অশথ গাছ রক্ষার জন্য তাঁর এত ব্যাকুলতা, এইজন্যই তাঁর দানে ব্যক্তিগত চরিত্রের উত্তাপ এত প্রবল ; এইজন্যই বিবেকানন্দের মতো ধর্ম-সংস্থা-আশ্রয়ী মানবসেবা বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বদেশসেবাত্মক মানবসেবা বিদ্যাসাগরের

পথ নয়। তাঁর সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও একই কথা। প্রাচীন হিন্দুঘেঁষা বলেই বিদ্যাসাগরী সমাজ সংস্কারের অবলম্বন মনু-পরাশর এবং লক্ষ্য কতকগুলি সামাজিক প্রথা। বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গীতা-উপনিষদের ধর্ম তাঁর অবলম্বন নয়। বিবেকানন্দের মতো শূদ্রজাগরণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো "জাতীয় জাগরণ" তাঁর লক্ষ্যও নয়। এইজন্য বলা যায় বিদ্যাসাগর প্রাচীন হিন্দুসমাজেরই প্রতিনিধি— প্রাচীন হিন্দুসমাজে সে রকম প্রতিনিধির বিরলতা দেখে বলা যায় না যে তিনি বিশেষ কোনো আধুনিক মতবাদের প্রতিনিধি, কেননা সব সমাজেই দেখা যায় ভাবধারা বিশেষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা বিরলসংখ্যক হয়ে থাকেন। হিন্দুসমাজ তাঁকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল, এ কথার দ্বারাও কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। কেননা সর্বত্রই দেখা যায় অসামান্য ব্যক্তিরা প্রতিযুগেই অসামান্য প্রতিকূলতা পেয়ে থাকেন।

(২) তবে এও বক্তব্য যে, বিদ্যাসাগর ১৯শ শতাব্দীর সন্তানও বটেন। তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ প্রাচীন ভাবধারার সাহায্যে বোধগম্য হলেও আস্তিকতার সহযোগী মানবসেবা এবং সমাজধারা রক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কার—এই দুটি মত ও পথে এসেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। 'প্রাচীন হিন্দুসমাজ' বলতে যে পাঁচমিশেলি জিনিস বোঝায়, তার মধ্যে এই দুটিকে বেছে নেওয়ার ফলেই বিদ্যাসাগর ১৯শ শতাব্দীর সন্তান; এ দুটোর পারলৌকিক তাৎপর্যের চেয়ে ঐহিক তাৎপর্যের উপর বেশি জোর দেওয়ার ফলেই তিনি বাঙলার 'জাগরণের' প্রতিনিধি, এবং এই দুদিক দিয়েই ব্রাহ্মসমাজ, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মতো নব্যহিন্দুর সঙ্গে তাঁর যোগ। 'আধুনিকতা'র হিসাব নিতে গেলে বলতে হয় শেষোক্তরা তাঁর চেয়ে বেশি 'আধুনিক'। যে অর্থে শাস্ত্রবাদের চেয়ে যুক্তিবাদ আধুনিক, সে অর্থেই তাঁরা বেশি আধুনিক। কিন্তু আগেই বলেছি এ-কথার দ্বারা বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব খণ্ডিত হচ্ছে না। কেননা মানুষ মহৎ হয় কর্মের গুণে, চরিত্রের গুণে, মনীষার গুণে—'আধুনিকতা'র ছাপ দিয়ে সারা অঙ্গ লিপ্ত করে নিয়েও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অত্যন্ত হীনচেতা ও ক্ষুদ্রাত্মা হতে বাধা নেই। আজকের ভারতে এই রকম হীনচেতা 'আধুনিকের' সংখ্যা অজস্র।

(৩) তবে কি 'আধুনিকতার' প্রয়োজন নেই ? 'আধুনিকতা' কথাটা এত বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয় যে এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। 'আধুনিকতা' অর্থে যদি বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রচলন বোঝায়, তবে অবশ্যই তার প্রয়োজন আছে। 'আধুনিকতা' অর্থে যদি হিন্দুসমাজের দোষগুলির সংস্কার বোঝায়, তবে অবশ্যই তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোন্‌গুলি হিন্দুসমাজের দোষ তা নিয়ে ১৯শ শতাব্দীতেও মতৈক্য ছিল না, আজো নেই। একথা ঠিক, বিদ্যাসাগর নাস্তিকও ছিলেন না, সমাজবিদ্রোহীও ছিলেন না, প্রাচীন রীতিনীতির বিদ্বেষ্টাও ছিলেন না।—কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তাঁর মতগুলোই ঠিক। প্রমাণও হয় না, আবার অপ্রমাণও হয় না। বর্তমান আলোচনার ফলে এইটুকুই অনুমান হয় যে, 'আস্তিকতার সহযোগী মানবসেবা' এবং 'সমাজধারা রক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কার',—১৯শ শতাব্দীর এই দুই প্রধান মত ও পথকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতমুক্ত করেই পরীক্ষা করা উচিত ; অতি যত্নে দেখা উচিত, ঐ দুই মত ও পথের বিদ্যাসাগরী রূপ, নব্যহিন্দু রূপ, এবং ব্রাহ্ম রূপের মধ্যে কোন্‌টা বর্তমান কালের পক্ষে বেশি উপযোগী। এমনও হতে পারে যে, এই তিন রূপই আজকের দিনে অচল। এমনও হতে পারে যে, নাস্তিকতা, সমাজবিপ্লব এবং প্রাচীন রীতিনীতির বিনাশই আজকের দিনের কাম্য,—কিন্তু সে কথাও আজ পর্যন্ত প্রমাণ-সাপেক্ষ। তাছাড়া, বিদ্যাসাগরের মতো প্রাচীন হিন্দুকে দিয়েও যখন এগুলোর প্রতি সমর্থন কুড়োনোর চেষ্টা দেখা যায় তখন খুব সহজেই বোঝা যায়, এগুলোর প্রামাণিকতার ভিত কত দুর্বল। বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি সন্দেহ নেই ; কিন্তু নাস্তিকতা, সমাজবিদ্রোহ এবং প্রাচীন রীতিনীতি-উচ্ছেদের মহিমা বাড়াতে হলে বীরসিংহের এই সিংহশিশুকে দিয়ে কাজ চলবে না।

'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

এক

১৯শ শতাব্দীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে দুটো চিন্তাসূত্রের উপর আমি জোর দিয়েছি। (১) আস্তিকতার সহযোগী মানবসেবা, (২) সমাজ-ধারারক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কার। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর নবজাগরণের মূলে আরও একটা সূত্র ক্রিয়া করেছিল: (৩) সংস্কৃতচর্চার সহযোগী ইংরেজিচর্চা। সাম্প্রতিক লেখকদের দ্বারা কেবল প্রথম দুটি সূত্রই বিকৃত হয়নি, তৃতীয়টা বিকৃত হয়েছে আরো বেশি। যাঁরা বিদ্যাসাগরের 'আস্তিকতা'কে বাদ দিয়ে তাঁর মানব-সেবার উপরেই জোর দেন এবং 'মানবসেবাতে'ও সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবধারায় কমিউনিস্টদের 'সায়েণ্টিফিক হিউম্যানিজ্‌ম' খুঁজে বেড়ান, যাঁরা বিদ্যাসাগরের সমাজধারারক্ষার দিকটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর সমাজ-সংস্কারকে সমাজবিদ্রোহ বা সমাজবিপ্লবের একটা প্রাথমিক সংস্করণ হিসাবে খাড়া করেন,—তাঁরা (খুব স্বাভাবিক ভাবেই) বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতচর্চা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ে তাঁর যে বিরূপ মন্তব্য, তারই উপর জোর দেন। বিদ্যাসাগর যে আদতে সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙলা নামে গ্রাম্য ভাষার উপর সংস্কৃতের পালিশ লাগিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনকস্বরূপ হয়েছিলেন, এ জিনিসটা তাঁদের কাছে কোনো গুরুত্ব পায় না। সাম্প্রতিক লেখকদের এই সংস্কৃতবিমুখতা কেবল বিদ্যাসাগরেই আবদ্ধ থাকেনি, 'রবীন্দ্রসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বঙ্গীয় সংস্করণ'—এমন নির্বোধ মতামতও আমাদের শুনতে হয়েছে। কাজেই আলোচনাটাকে কেবল বিদ্যাসাগরে আবদ্ধ না রেখে সাধারণ ভাবে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার মানসিক জাগরণের উপর সংস্কৃতচর্চার কতটা প্রভাব ছিল তা নিয়ে কয়েকটা কথা বলব। সবশেষে দেখাব: বিদ্যাসাগরের কীর্তি

এক্ষেত্রেও তথাকথিত 'আধুনিক বিদ্যাসাগরের' পূজারীদের দ্বারা কি পরিমাণ বিকৃত হয়েছে বা হচ্ছে।

॥ দুই ॥

প্রথমে সে-যুগের সংস্কৃতচর্চার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হয়। সে-যুগের সংস্কৃতচর্চা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশেই কিছু নূতন শিক্ষা দিতে চেয়েছিল, অর্থাৎ আধুনিক যুগের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই সে-যুগের ইংরেজিনবিশ বাঙালীরা সংস্কৃতের চর্চা করেছিলেন। প্রাচীনের সাহায্যে নবীনের পুষ্টি—এইটেই রেনেসাঁসের লক্ষণ এবং এ লক্ষণ সে-যুগের সংস্কৃতচর্চার প্রায় প্রত্যেকটি বিভাগেই দেখা যায়। প্রথমে ধর্মের কথা ধরা যাক।

ধর্ম সম্বন্ধে দেখা যায়, রামমোহন ও বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যাই সে-যুগে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাঁদের উভয়ের ক্ষেত্রেই সে ব্যাখ্যার মূল ছিল বেদান্তচর্চায়। কিন্তু তাঁরা কেউই প্রাচীন ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার চর্বিতচর্বণ করেননি। রামমোহন মায়াবাদী ব্যাখ্যা ত্যাগ করেছিলেন, তার কারণ জগতের মায়াময়ত্ব নিয়ে আমাদের দেশের ধর্মধ্বজীদের মধ্যে অনেকদিন যাবৎ যে ভণ্ডামি চলে আসছিল, যে ভণ্ডামির বশে তামসিক নৈষ্কর্ম্যকেই এককালে বেদান্তমত বলে প্রচার করা হত, রামমোহন সেইখানটাতেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। তিনি মায়াবাদকে বর্জন করেননি, কিন্তু তিনি মায়াবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতেও সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় কর্মের উপর। জগদ্ধিতায় যে কাজ করতে চায় তার বিষয়াসক্তির 'মায়ায়' বদ্ধ হলে চলে না, এইটেই বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা। এই দুই ব্যাখ্যার মূলে ছিল স্বাধীনভাবে সংস্কৃতচর্চার সাহস এবং সেই সাহসের প্রেরণা ছিল ইংরেজিশিক্ষায়। কিন্তু এখানে আমি রামমোহন-বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আর কিছু না বলে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যার একটু বিস্তারিত পরিচয় দেব। তার কারণ humanism বা মানবধর্মবাদ নামে যে ইউরোপীয় মতটাকে সাম্প্রতিক লেখকরা বিনা তথ্য-

প্রমাণে বিদ্যাসাগরের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে সে যুগে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রই বোঝাপড়া করেছিলেন এবং সে জিনিসটা তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবেই করেছিলেন।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপে যে নাস্তিকমতের প্রবলতা দেখা যায় তার ফলে পাশ্চাত্যজগতে মানবধর্মবাদ বা humanism মতের বিকাশ হয়, ওগুস্ত, কোঁৎ প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তি এর মূল। কার্ল মার্ক্সের কল্যাণে বিংশ শতাব্দীতে এই মতের প্রভাব বোধ হয় ধর্মের চেয়ে বেশী। হিউম্যানিজ্‌ম-এর মত নূতন নয়। গ্রীকদের মধ্যেও এর চলন ছিল। মানুষের যে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি 'রিপু', এবং ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি 'গুন'—হিউম্যানিস্টদের মতে এগুলোর দমন ও বিকাশের দ্বারা এমন একটা অবস্থার উৎপত্তি হতে পারে, যাতে এই বৃত্তিগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়; সেইটেই মানুষের স্থায়ী সুখের উপায়, সেইটেতেই মনুষ্যত্ব। হিউম্যানিস্টদের মতে বৃত্তির এই সামঞ্জস্যই 'মানবধর্ম', এর জন্যে সংসারের বাইরে গিয়ে কোনো ভগবানের অস্তিত্ব মানতে হয় না।

বঙ্কিমের মতে এই নাস্তিক মানবধর্মবাদের মত অসম্পূর্ণ বা আংশিক সত্য। তাঁর মতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ভগবানকে বাদ দিয়েই হতে পারে, কিন্তু শক্তিগুলোর সামঞ্জস্যের কোনো জাগতিক উপায় নেই। একজন মানুষ খুব শক্তিমান হতে পারে, কিন্তু তার শক্তিচর্চাকে কোন্ জায়গায় থামাতে হবে সে কথা কে বলতে পারে? হিউম্যানিস্টরা বলবেন, শারীরিক শক্তিচর্চা এমন করে কর যাতে মানসিক শক্তিচর্চায় বাধা না হয়। কিন্তু বাধা যে হচ্ছে না তার যাচাই করবে কে? আমি এত ঘণ্টা ব্যায়াম করব, এত ঘণ্টা বই পড়ব, এত ঘণ্টা রাজনীতির চর্চা করব—এরকম যান্ত্রিক হিসাবের দ্বারা আদর্শ ছাত্র গড়া যেতে পারে কিন্তু আদর্শ মানুষ গড়া যায় না। বঙ্কিম গীতার ভক্তিবাদে সামঞ্জস্যের যথার্থ উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে শক্তিগুলোকে ভগবানের দিকেই অভিমুখী করতে হবে, তা নইলে তাদের সীমা বা সামঞ্জস্যের কোনো উপায় পাওয়া যাবে না। গীতার যে জ্ঞান-কর্ম-ভোগ-বাসনা সমস্তকেই ভগবানে সমর্পণ করতে বলা হয়েছে —বঙ্কিমের মতে সেইটেই হিউম্যানিস্টদের শক্তিস্ফূরণ ও শক্তিসামঞ্জস্যতত্ত্বের যথার্থ

ব্যাখ্যা। অবশ্য আজকালকার পাকা হিউম্যানিস্টরা বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে'র মত মানবেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন-শাস্ত্রচর্চার ফলে নাস্তিক মানবধর্মবাদের একটা প্রকাণ্ড ফাঁক বঙ্কিম অতি সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। এই ফাঁক যে কত প্রকাণ্ড, আজকালকার ইউরোপের হিউম্যানিস্ট চিন্তার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আজকের হিউম্যানিস্টদের কেউ কেউ বলেন, উপযুক্ত পরিমাণে লালসা-পূরণের দ্বারাই শক্তিগুলোর সামঞ্জস্য এবং জীবনের পূর্ণতা—এঁরা ফ্রয়েড্-শিষ্য। আর একদল বলেন, শক্তিগুলোকে রাষ্ট্র বা প্রোলেটারিয়েটের দিকে অভিমুখী করাই সামঞ্জস্য ;—এঁরা মার্ক্সের শিষ্য। এই সমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ ও অব্যবস্থিত মতামতের দিকে তাকালেই বঙ্কিমের মতের মূল্য বোঝা যায়। কিন্তু এও বোঝা যায় সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চাই বঙ্কিমের এই মূল্যবান চিন্তার মূল। রামমোহন ও বিবেকানন্দের ধর্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও একথা খাটে এবং ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীদের মানসিক জাগরণের যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, সেই ধর্মবিষয়ক চিন্তা সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা খাটে। সংস্কৃতচর্চার সহযোগী ইংরেজিচর্চা ছাড়া ও-সব চিন্তার সৃষ্টি হত না।

॥ তিন ॥

সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা সত্য। আমরা মনে করি আমাদের নবযুগের সাহিত্যে ইংরেজির প্রভাব বেশি, কিন্তু সেও ভুল কথা। বাঙলা গদ্যপদ্যের যে রূপটাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, অর্থাৎ গদ্যে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং পদ্যে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের ভাষা—এগুলোর উপর সংস্কৃতচর্চার প্রভাব ইংরেজি-চর্চার চেয়ে অনেক বেশি। ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা আমাদের লেখকদের কাছে কল্পনাজগতের অনেক দ্বার খুলে দিয়েছিল, একথা যেমন সত্য—সংস্কৃত ভাষার পালিশ লাগিয়ে বাঙলা নামে গ্রাম্য ভাষার একটা মার্জিত রূপ দেওয়া হয়েছিল এবং তারই উপর খাড়া হয়েছিল নবযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইমারত, একথাও তেমনি সত্য। সাহিত্যে কল্পনার যত বৈচিত্র্য বা উৎকর্ষই থাক, উপযুক্ত ভাষা না

থাকলে সাহিত্য হয় না। এটা অত্যন্ত সহজ কথা, কিন্তু এই সহজ কথাটা যাঁরা মুখে স্বীকার করেন, তাঁরাও বুঝতে চান না, একালের বাঙলা গদ্যপদ্যের পিছনে সংস্কৃতের পালিশ কতখানি কাজ করেছে। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এই-মাত্র আমি দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি : 'অত্যন্ত' আর 'স্বীকার করেন'। একশো বছর আগেও মৌখিক ভাষায় একথাগুলোর স্থান ছিল কিনা সন্দেহ। 'খুব' আর 'মান্তি করেন' এগুলোই ছিল চল্‌তি কথা। এই চল্‌তি কথাগুলো যে আজ অচল হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু ওগুলোর পাশাপাশি পূর্বোক্ত সংস্কৃত শব্দগুলো এত সহজে স্থান করে নিয়েছে যে কেউ সেটা লক্ষ্যই করে না, অথবা লক্ষ্য করলেও বোঝে না ইতিমধ্যে ভাষার একেবারে রঙ ফিরে গেছে।

যারা বোঝে তারা এও বোঝে যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ,—আমাদের এই তিনজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকের হাতে ভাষার যে ক্রমবিকাশ হয়েছিল সেটাকে "সাধু" থেকে "কথ্যের" দিকে ক্রমবিকাশ বললে সবটুকু বলা হয় না। এই তিনজনের গদ্যে কথ্য শব্দের ভাগ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে—এইটুকুই সত্য ;—কিন্তু সংস্কৃতের পালিশটাকে তাঁরা কেবল বজায় রেখেই সন্তুষ্ট হননি, কোনো কোনো জায়গায় ক্রমান্বয়ে বাড়িয়েও ছিলেন। বিদ্যাসাগর কখনো 'মনন' লিখতেন না, লিখতেন 'বিচার' ; 'পরিকীর্ণ' লিখতেন না, লিখতেন 'বিকীর্ণ' বা 'সমাচ্ছন্ন' ; 'প্রবর্তনা' লিখতেন না, লিখতেন 'প্রেরণা' ; 'উদ্‌ভাবনা' লিখতেন না, লিখতেন 'সৃষ্টি' ; 'পরিশীলন' লিখতেন না, লিখতেন 'অনুশীলন'। 'মনন', 'পরিকীর্ণ,' 'প্রবর্তনা', 'উদ্‌ভাবনা', 'পরিশীলন' প্রভৃতি রাবীন্দ্রিক শব্দ বিদ্যাসাগরী শব্দের চেয়ে অনেক বেশী সংস্কৃতগন্ধী। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের ক্রমবিকাশকে আমরা যদি ক্রমবিকাশ বলে স্বীকার করি তাহলে এ জিনিসটার অর্থ বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না।

॥ চার ॥

সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে যে কথা বলা হল, সাহিত্যের কল্পনা বিশেষ করে চরিত্র-কল্পনা সম্বন্ধেও সেটা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এমনকি ঐতিহাসিক উপন্যাসও সংস্কৃতচর্চার ফল নয়। এগুলোর আঙ্গিক ও চরিত্র-কল্পনার মূল খুঁজতে হলে স্কট এবং শেক্‌স্‌পীয়রের নায়কদের মধ্যেই খুজতে হবে,—বিশেষ করে শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের নৈকট্য। কিন্তু তাঁর নায়কদের চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা প্রাচীন ভারতীয় বীরচরিত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে বলে বোধ হয়। রাজসিংহ, ভবানী পাঠক, সীতারাম, সত্যানন্দ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্বপ্নদর্শীর চরিত্র যে ছাঁচে ঢালা সেটা ঠিক শেক্‌স্‌পীয়রী ছাঁচ নয়, ভীষ্মার্জুন প্রভৃতির সঙ্গেই তার যোগ। প্রবৃত্তির উগ্রতা এদের কারো মধ্যেই শেক্‌সপীয়রের নায়কদের মতো উলঙ্গ নয়, এমনকি সীতারামের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। সীতারাম-চরিত্রের মূল বোধ হয় এ্যাণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রার নায়ক-চরিত্রে। কিন্তু এ্যাণ্টনির মহিমা তার বীরত্বে এবং সেই বীরত্বের দারুণ পরিণতিতে,—সীতারামেও তাই বটে কিন্তু একটু তফাত আছে। সীতারামের মধ্যে লেখক ধর্মবুদ্ধির একটা প্রচ্ছন্ন ভাব সব সময়েই চাপা দিয়ে রেখেছেন, শেষ মুহূর্তে সেটা দপ করে জ্বলে উঠেছে অনেকটা অর্জুনের 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা' রকমের জিনিস। বঙ্কিমের কৃতিত্ব এই যে, এ ভাবটা কোনো আকস্মিক পোয়িটিক জাস্টিসের কায়দায় ঘটানো হয় নি, চরিত্রের ছাঁচটার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজসিংহ প্রভৃতিতে এই ধর্ম-বুদ্ধি আরো স্পষ্ট। এদের মহিমা একটা মহাকায় স্থৈর্যের মহিমা—প্রাচীন মহাকবিদের রাজর্ষিচরিত্রের সঙ্গেই এদের মিল। কালিদাস তাঁর দিলীপ রাজার বর্ণনায় লিখেছিলেন:

"তিনি রাজলক্ষ্মীর সমস্ত চিহ্ন ত্যাগ করে বনে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহ থেকে বিশেষ একটা তেজের স্ফুরণবশতঃ বোধ হচ্ছিল রাজশ্রীকে তিনি যেন সব সময়েই অঙ্গে ধারণ করে আছেন। বোধ হচ্ছিল তিনি যেন এক মদমত্ত

গজরাজ : এমন গজরাজ যার মদমত্ততা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্গূঢ়, কোনো প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্রাবের দ্বারা প্রকাশিত নয়।”

এ বর্ণনা বঙ্কিমের নায়কদের সম্বন্ধে বেশ খাটে, এবং একথা যদি সত্য হয়, তবে তাঁর সংস্কৃতচর্চাকেই সেজন্যে দাম দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের নায়কদের সম্বন্ধে একথা আরো বেশি সত্য। তাদের চরিত্রে মহিমার দিকটুকু সচরাচর সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পাওয়া। আধুনিক যুগের পটভূমিকায় লেখা রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পকবিতাতেই বোধ হয় এমন চরিত্র নেই যার সম্বন্ধে ‘মহিমা’ শব্দটা খাটে—একমাত্র ‘গোরা’ এ কথার ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের অজস্র ‘আধুনিক’ গল্পকবিতার চরিত্র-কল্পনায় মাধুর্য আছে, স্নিগ্ধতা আছে, অপূর্ব লাবণ্য আছে—কিন্তু মহিমা আছে কিনা সন্দেহ। অন্যদিকে কর্ণ, গান্ধারী প্রভৃতি চরিত্র, গান্ধারীর আবেদনের যে-কোনো চরিত্র, সোমক চরিত্র, কথা ও কাহিনীর অধিকাংশ চরিত্র—এক কথায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রাচীন ভারতের যে কোনো চরিত্রেই এই মহিমার দিকটা জাজ্বল্যমান। অবশ্য এই মহিমার অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর সংস্কৃতচর্চার দানও এতে কম নয়। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কর্ণ-দুর্যোধনকে নেওয়া যাক। মধ্যযুগে এসব চরিত্রের কল্পনায় যে অবনতি দেখা দিয়েছিল যাত্রার কর্ণ-দুর্যোধনে তার পরিচয় পাই। দানবীর কর্ণ তাঁর ছেলের মাংস কেটে বামুনকে খেতে দিলেন, আর দুর্যোধন হিন্দি সিনেমার ‘খলনায়কদের’ মতো নিপাট বদমায়েসিতে তৎপরতা দেখাতে লাগলেন, এসব চিত্রে আর যাই থাক মহিমা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে কর্ণ-দুর্যোধনকে আঁকলেন তাদের চরিত্রকে তিনি ব্যাসের আঁকা প্রাচীন কল্পনার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েই মহিমার ভাগটা পুনরুদ্ধার করলেন ;—প্রগাঢ় সংস্কৃতচর্চা ছাড়া সে জিনিসটা সম্ভব হত না। ‘গান্ধারীর আবেদনে’ দুর্যোধনের মুখে যে বিশেষ কথাগুলি বসানো হয়েছে, মূল মহাভারতে ঠিক ঐ কথাগুলো বোধ হয় কোথাও নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার অধর্মও এমন একটা দীপ্তি পেয়েছে যা খলনায়কের খলতা নয়, সম্পূর্ণ অন্যজাতের জিনিস। সে জিনিসটার মূল ছিল

ব্যাসের মহাভারতে এবং তার পুনরুদ্ধার ঘটেছিল মৌলিক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার দ্বারা। এই নিষ্ঠার অভাব হলে কী ঘটে আজকের বাঙলা সাহিত্যের দিকে তাকালেই সেটা চট করে বোঝা যায়। সাম্প্রতিক বাঙলা গল্পের নায়ক-নায়িকারা যে শুধুমাত্র কামকেলিতেই নৈপুণ্য দেখায়—মহিমা দূরে থাক সামান্যতম মাধুর্য, স্নিগ্ধতা, লাবণ্য থেকেও তারা যে বঞ্চিত, আজকালকার লেখকদের সংস্কৃত-বিমুখতাকেই তার কারণ বলে নির্দেশ করলে অন্যায় হয় না।

॥ পাঁচ ॥

সে-যুগের ইতিহাসচর্চার কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাঙলার জাগরণের পৌরাবৃত্তিক সংস্কৃতচর্চা প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের দান। কিন্তু ইউরোপীয়েরা বৈদিক যুগ আর বৌদ্ধযুগ ছাড়া ভারতের ইতিহাসে কোনো ভালো জিনিস দেখতে পাননি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের ইতিহাসচর্চা ইংরেজি ভাষাতেই আবদ্ধ ছিল বলে বাঙলার জাগরণে তা একটা ক্ষীণ অনুপ্রেরণার বেশি কিছু জোগাতে পারেনি। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ভারততাত্ত্বিকদের চেষ্টায় ইউরোপীয় গবেষণার একদেশদর্শিতার কতকটা প্রতিকার হয়। কিন্তু এসব তত্ত্বকে একদেশদর্শিতা পরিহার করে—বাঙালীর পক্ষে সুগম করার যথার্থ চেষ্টা হয় বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'। 'বঙ্গদর্শনে'র অজস্র প্রবন্ধে এবং 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম প্রাচীন পুরাবৃত্তচর্চার এই নূতন ভঙ্গিটা আরো বিশদ করেন। রমেশ দত্ত ঋগ্‌বেদসংহিতার অনুবাদ করে বৈদিক যুগের গৌরবজনক স্মৃতিটুকু পুনরুদ্ধার করেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেন। ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা যে সম্পূর্ণ এক জিনিস নয় এবং এক জিনিস না হওয়া মানেই যে বাজে জিনিস হওয়া নয়—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই বোধটা জাগিয়ে তোলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র আগে যাই হোক না কেন, 'বঙ্গদর্শন' থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী-সমাজ' পর্যন্ত সে যুগের পুরাবৃত্তচর্চায় একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষে এই ধারার দান

অবিস্মরণীয়। কিন্তু তার চেয়ে যেটা বড় কথা,—ভারত সভ্যতার নিবে-যাওয়া বাতিটাকে সেদিন নূতন করে জ্বালিয়ে তুলে আধুনিক জাগরণের অংশরূপে গ্রহণ করার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে সম্ভাবনা ফলবতী হয়নি, কেননা তার পর থেকে আমাদের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে আগ্রহের পরিমাণ কমতে শুরু করে। এখন যে অবস্থা হয়েছে তার এক প্রধান লক্ষণ এই যে, ভারত পুরাবৃত্তচর্চা আজ সম্পূর্ণ কেতাবী জিনিস হয়ে পড়েছে। অথচ এও আমরা দেখতে পাই, এ অবস্থাটা মোটেই অনিবার্য ছিল না। কেবলমাত্র বাঙলার ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলো থেকে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের রচনা পর্যন্ত ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই ক্রমবিকাশের ফল তো শিক্ষকসমাজ ও গুটিকতক রিসার্চ স্কলারের বাইরে সাধারণ শিক্ষিতসমাজে ফলেনি,—বঙ্কিমের ভাষায়, বাঙালীর ইতিহাস অনেকখানি পুনরুদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী তো 'মানুষ' হয়নি। কেন হয়নি তার অন্যান্য কারণ যাই হোক, একটা বড় কারণ হচ্ছে আজকালকার ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃত-(ও প্রাকৃত-) বিমুখতা, যে বিমুখতা আজ সাধারণ পাঠকের মনে অশোকশিলালিপির মতো ইতিহাসের স্বর্ণভাণ্ডার করায়ত্ত করার আগ্রহকেও নিস্তেজ করে রাখে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বাঙালীর ইতিহাস জেনে বাঙালী আবার মানুষ হবে এমন আশাই বা আমরা কেমন করে করি? অশোকলিপির সঙ্গে তুলনা করলে ধর্মপাল বা দেবপালের লিপিকে কোনো-মতেই স্বর্ণভাণ্ডার বলা যায় না। কাজেই যে সমস্ত পাঠক জম্বুদ্বীপভূমিতে 'দেবমানব-সংমিশ্রণে'র অশোকীয় বিবরণ পাঠ করেও রোমাঞ্চিত হতে চায় না তারা যে পালরাজাদের লৌহভাণ্ডার করায়ত্ত করতে প্রলুব্ধ হবে না সেটা আশ্চর্য নয়। এইটেই আশ্চর্য যে, সংস্কৃতবিমুখতা আমাদের আজ শুধু বাঙলার ইতিহাস বা ভারতের ইতিহাসের প্রতিই বিমুখ করেনি, সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রতিই বিমুখ করেছে। তার ফলে দেশ জুড়ে আজ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে: সাম্প্রতিক

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের একভাগের কাছে ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব থেকে, আর একভাগের কাছে ১৯৪৯ সালের চীনবিপ্লব থেকে, আর একভাগের কাছে অসহযোগ আন্দোলন থেকে। এ দৃশ্য দেখলে বুদ্ধিমান লোককে লজ্জা পেতে হয় এবং সংস্কৃত-চর্চা-প্রবণ ১৯শ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে আজকের ভারতের সংস্কৃতবিহীন শিক্ষিত সমাজের তুলনা করতে গিয়ে যে-কোনো লোককেই বোধ করতে হয় দারুণ সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা।

॥ ছয় ॥

যে দিক দিয়েই দেখা যাক, সংস্কৃতচর্চার সহযোগী ইংরেজিচর্চা ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর মানসিক জাগরণের একটা অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এই উপাদানে বিদ্যাসাগরের দান বিশেষভাবে ভাষাসংস্কারকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ বটে, কিন্তু আমাদের গদ্যের ক্রমবিকাশে ঐ সংস্কারের অপরিহার্যতার কথা আমি আগেই আলোচনা করেছি। আজকের বাঙালীর সংস্কৃতবিমুখতার ফলে এই ক্রমবিকাশের ধারাটাও বিপন্ন হয়েছে। বিদ্যাসাগরকে যাঁরা আজ 'সমাজবিপ্লবী', 'মানবতাবাদী' প্রভৃতি স্বকপোলকল্পিত খেতাব দিয়ে তাঁর একটা অলীক প্রতিমা খাড়া করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন এবং দেশের লোককে দুহাত তুলে ডেকে বলছেন—তোমরা এই 'আধুনিক' প্রতিমার পায়েই ফুলবেলপাতা দাও—তাঁরা, অন্যান্য দিকের মতো এই ভাষার দিকটাতেও বিদ্যাসাগর ও ১৯শ শতাব্দীর ধারাটাকে বিকৃত না করে শান্তি পাচ্ছেন না। এই রকম একজন লেখক এই স্বকপোলকল্পিত বিদ্যাসাগরের স্তুতি করতে গিয়ে লিখেছেন: বিধবাবিবাহ উনিশ শতকের একটা "জ্বলন্ত প্রশ্ন"। এঁর বিশ্বাস, "জ্বলন্ত প্রশ্ন" কথাটা "গুরুতর বিষয়" কথাটার চেয়ে অনেক বেশী "জ্বলন্ত" বাঙলা,—এর চেয়ে কম "জ্বলন্ত" বাঙলায় বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহের মহিমাটা ঠিক-ঠিক প্রকাশ পেত না। ইনি ভুলে গেছেন: বিদ্যাসাগর নিজে বিধবাবিবাহকে তাঁর জীবনের "সর্বপ্রধান সৎকর্ম" বলেই খুশী ছিলেন। ইনি ভুলে গেছেন, "জ্বলন্ত প্রশ্নের" মতো ইংরেজিগন্ধী বাঙলা বিদ্যাসাগর কখনো বরদাস্ত

করতেন না। ইনি হয়তো বিদ্যাসাগরী বাঙলাকেও ‘সংস্কৃতগন্ধী’ বলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে দলে টানার চেষ্টা করবেন কিন্তু সে চেষ্টা ধোপে টিঁকবে কিনা সন্দেহ। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের বিবর্তনে সংস্কৃতের অনিবার্য ভূমিকা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। প্রমথ চৌধুরীর স্থান এঁদের চেয়ে নীচুতে, কিন্তু তিনিও ইংরেজিগন্ধী বাঙলা লিখতেন না। অতএব এদিক থেকেও বোঝা যাচ্ছে “জলন্ত প্রশ্নের” মতো বাজে বাঙলায় যে বিদ্যাসাগরের পূজা হয়, সে বিদ্যাসাগর কতকগুলো ব্যক্তি বা দলের তৈরী এক স্বকপোলকল্পিত বিদ্যাসাগর। আসল বিদ্যাসাগর যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে এরকম বাজে বাঙলায় তাঁর স্তুতিবাদ হতে শুনলে দ্বিতীয়বার তাঁর মাতৃভূমি ছেড়ে কার্মাটাড়ের সাঁওতালভূমিতে পালিয়ে যেতেন। কেননা তাঁর মতো তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী লোক অতি সহজেই বুঝতে পারতেন—এরকম বাঙলার চেয়ে সাঁওতালী বাঙলাও ঢের বেশি ভালো।

———

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ

॥ পরিবর্তন যুগ ॥

(১৯১১-১৯৪৭)

১। প্রমথ চৌধুরীর যুগ।
২। মোহিতলাল মজুমদার।
৩। নীরদ চৌধুরী।

॥ দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা ॥

স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছরের যুগকে বাঙালী মনের 'পরিবর্তন যুগ' বলা যায়। এর আগের যুগকে 'বাঙলার নবজাগরণ' বা 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' যুগ বলা হয়েছে।

কারা এই পরিবর্তন যুগের সবচেয়ে নামজাদা বাঙালী?—রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, যদুনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ এবং আরো কেউ কেউ *। চিত্তরঞ্জন-সুভাষকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়, কেননা তাঁরা যদিও বাঙালী মনকে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রভাব মূলতঃ রাজনৈতিক। শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ যা নিয়ে এ বইয়ের কারবার সেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—তাঁদের প্রভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ প্রভৃতির প্রভাবকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব—শিক্ষায় সভ্যতায় তাঁদের কৃতিত্বের সীমা নেই। তাই যদি হয় তবে আমি অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত দুই ব্যক্তিকে—প্রমথ চৌধুরী এবং মোহিতলাল মজুমদারকে এই পরিবর্তন যুগের প্রতিনিধিরূপে খাড়া করছি কেন?

তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ প্রভৃতির কর্মজীবন এই যুগকে ব্যাপ্ত করে থাকলেও তাঁরা আসলে 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' প্রতিনিধি অর্থাৎ পূর্বতন যুগের প্রতিনিধি। আমি যে তালিকা দিয়েছি, একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সেই তালিকাভুক্ত মনীষীদের মধ্যে কেউ বা ব্রাহ্ম কেউ বা—বঙ্কিমচন্দ্র যাদের 'নব্যহিন্দু' বলতেন—তাই। এই দুটি পদবী 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কাজেই যাঁদের সম্বন্ধে ঐ পদবী খাটে, তাঁরা প্রত্যেকেই 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের'

---

* এই আরো কেউ কেউ-এর মধ্যে আছেন জগদীশচন্দ্র, বিপিন পাল এবং আশুতোষের মতো নামজাদা ব্যক্তি।

প্রতিনিধি। শরৎচন্দ্রকে আপাতদৃষ্টিতে ব্যতিক্রম মনে হতে পারে। তিনি 'দত্তা' প্রভৃতি উপন্যাসে ব্রাহ্মদের নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন, বাকি উপন্যাসগুলিতে লিখেছিলেন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড ও মর্মভেদী নালিশের গদ্যকাব্য। কিন্তু তবু বলব, তাঁর উপন্যাসের রস মূলতঃ হিন্দুজীবনের রস। এমনকি তাঁকেও 'নব্যহিন্দু' বলা যায়, যদিও তাঁর 'নব্যহিন্দুত্ব' কতকটা সৃষ্টিছাড়া। আজকের শরৎ-বিরোধীরাও এ জিনিসটা বেশ ভালোভাবে জানেন, এবং জানেন বলেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আজকাল একটা কমিউনিস্ট বা সেকিউলারিস্ট প্রতিমা গড়ার যেমন চেষ্টা চলছে, শরৎচন্দ্রকে নিয়ে তেমন হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে কমরেড্ শিবদাস ঘোষ ছাড়া আর কেউ শরৎচন্দ্রকে লাল সেলাম পর্যন্ত জানাননি। সম্প্রতি একটা খুব মজার তথ্য জানা গেল। চিত্তরঞ্জন নাকি শরৎচন্দ্রকে একটা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দিয়ে গিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্র তাতে পূজো না দিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জল খেতেন না। অবশ্য পূজোটাও তিনি করতেন শরৎচন্দ্রীয় কায়দায়—মন্ত্রপড়ার বদলে প্রতিমার সামনে বসে একটা গান গাইতেন, সে গান রাধাকৃষ্ণ-বিদ্বেষী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের গান। যাঁরা 'পথের দাবী' ও 'শেষ প্রশ্ন'কে শরৎচন্দ্রের হিন্দুবিরোধিতার চরম দলিল ভেবে তাঁকে বিপ্লবী দলে টানবার চেষ্টা করছেন তাঁরা যেন এই তথ্যটা একটু ভেবে দেখেন, এবং বুদ্ধির গোড়ায় কিঞ্চিৎ ধোঁয়া দিয়ে, বাড়ীতে বসে এটাকে পরিপাক করবার চেষ্টা করেন।

অতএব পরিবর্তন যুগের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামানন্দ, শরৎচন্দ্র এবং যদুনাথ সরকার নন। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাতিপ্রাপ্ত প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদারকে নিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যুগটা যখন সচল ছিল তখন নিশ্চয় কেউ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ফেলে এই দুইজনকে তৎকালীন বাঙালী মনের প্রতিনিধি ভাবত না। কিন্তু এও যেন আমরা মনে রাখি যে, সেদিন ঐ যুগকে কেউ 'পরিবর্তন যুগ' বলেও জানত না। তারা বলত 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' যুগই চলছে এবং আরো কিছুদিন চলবে। এমনকি যদুনাথের মতো আর্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঐতিহাসিক পর্যন্ত এমন কথা প্রকাশ্যেই

বলেছিলেন। বহুকাল আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাঙলার ইতিহাস'-এর উপসংহারে তিনি সে-কথা কাগজে কলমে লিখে গিয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ১৯৪৮ সালেও যদুনাথের মতো মনীষী বোঝেননি, 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' অতীতের কবরে কবরস্থ হয়েছে—আরম্ভ হয়েছে 'কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টের যুগ'। কিন্তু ১৯৪৮ সালে যদুনাথের পক্ষে ক্ষীণদৃষ্টির যে সাফাই ছিল আজ আমাদের পক্ষে তা নেই। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দকে বাদ দিয়ে প্রমথ চৌধুরী-মোহিতলালকে আমি পরিবর্তন যুগের প্রতিনিধি ধরেছি।

'পরিবর্তন যুগ' কাকে বলে? স্বদেশী আন্দোলনের আগের যুগকে যদি বলি 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের যুগ', তবে স্বাধীনতার পরের যুগকে বলতে হয় 'কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টের যুগ'। কিন্তু যুগ থেকে যুগান্তরে যাবার সময় ইতিহাসের মানুষ ঠিক লাফ দিয়ে যায় না। মাঝখানে থাকে একটা অনিশ্চয়ের কাল—মনীষী ব্যক্তিরাও তখন যুগের গতিবিধি সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হন। ইংরেজিতে এই অনিশ্চয়-কালের একটা চমৎকার নাম আছে: Interregnum। 'স্বদেশী' থেকে 'স্বাধীনতা' বাঙালীর মনের জগতে সেই Interregnum। মোহিতলাল-প্রমথ চৌধুরী সেই Interregnum-এরই প্রতিনিধি। 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' তাঁরা সন্তান মাত্র—প্রতিনিধি নন। একথা ঠিক, তাঁরা কমিউনিস্টও ছিলেন না, সেকিউলারিস্টও ছিলেন না, কিন্তু 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' প্রতি আনুগত্যের দাবি করে তাঁরা আসলে কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্ট ধ্যানধারণার পথটাই পাকা করেছিলেন। এইটেই Interregnum-এর লক্ষণ। যাঁরা বলেন (যথা নীরদ চৌধুরী) কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টরাই 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'কে হত্যা করেছে—তাঁরা এই অনিশ্চয়কালের কথা চিন্তা করলে কতকটা শান্তি পেতে পারেন।

নীরদ চৌধুরীকেও এই অনিশ্চয় যুগের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত কি না তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। নীরদবাবু খ্যাতিলাভ করতে শুরু করেন ১৯৫০ সালের পর থেকে, কাজেই অনেকে ভাবতে পারেন তাঁর আসন কমিউনিস্ট-সেকিলারিস্টদের সঙ্গে। তাছাড়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তিনি যে উগ্রতা

দেখিয়েছেন তার কাছে কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্ট উগ্রতাও ছেলেখেলা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর হিন্দুসমাজ-বিরোধিতা তাঁর কমিউনিস্ট-বা সেকিউলারিস্ট-বিরোধিতার চেয়ে তীব্র নয়। পক্ষান্তরে (হিন্দুদের প্রতি না হোক) ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দুদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথাও তিনি তাঁর অসামান্য ভাষায় বারে বারে ব্যক্ত করেছেন। কাজেই অনিশ্চয়ের পরিমাণ তাঁর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। তাঁকে 'নিহিলিস্ট'ও বলা যেতে পারে। এও Interregnum-এর লক্ষণ।

———

প্রমথ চৌধুরীর যুগ

॥ এক ॥

প্রমথ চৌধুরীকে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার 'জাগরণের' অবসানযুগের একজন ভাবনায়ক বলা যায়। ১৯১১ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার এবং ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী বদলেই স্বদেশী আন্দোলনের যথার্থ সমাপ্তি ধরা উচিত —বাঙলা দেশের মানসিক জাগরণের অবসানও শুরু হয় ঐ সময় থেকে। "সবুজ পত্র" ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়—ঐ পত্রের সম্পাদকরূপেই প্রমথ চৌধুরী শিক্ষিত বাঙালীর মনোজগতে কিছুদিনের জন্য আধিপত্য করেন। তাঁর আগে এমন কোনো নামজাদা লোক পাওয়া শক্ত যাঁকে বাঙালীর মানসিক জাগরণের অবসান-মুহূর্তের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

অনেকে একথা শুনলে বিস্মিত—কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হতে পারেন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সাহিত্যে কথ্যভাষা ব্যবহারের দ্বারা প্রমথ চৌধুরী বাঙলার জাগরণের একটি ধারায় অনেকখানি শক্তি সঞ্চার করেন। এই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ভুল বলা যায় না, কিন্তু অনেকেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন। অনেকেই ভুলে যান, প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যে চলতি ভাষার 'প্রবর্তক' নন। হুতোমের নক্‌শা, বিবেকানন্দের গদ্য, রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র—এগুলো সবই প্রমথ চৌধুরীর পূর্বগামী জিনিস। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি চলতি ভাষার প্রথম ব্যবহারে নয় —রবীন্দ্রনাথকে সাধুভাষা ত্যাগের অনুপ্রেরণা দেওয়াতেই তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন চলতি ভাষাকে স্বীকৃতি না দিতেন, তাহলে ও ভাষা আজো আমাদের মধ্যে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বাঙালীর মানসিক জাগরণে ভাষার দিকটাই একমাত্র দিক নয়; অন্যান্য দিকে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারায় আমাদের জাতীয় জাগরণের অবসান-লক্ষণ স্পষ্ট।

দেখিয়েছেন তার কাছে কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্ট উগ্রতাও ছেলেখেলা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাঁর হিন্দুসমাজ-বিরোধিতা তাঁর কমিউনিস্ট-বা সেকিউলারিস্ট-বিরোধিতার চেয়ে তীব্র নয়। পক্ষান্তরে (হিন্দুদের প্রতি না হোক) ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দুদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের কথাও তিনি তাঁর অসামান্য ভাষায় বারে বারে ব্যক্ত করেছেন। কাজেই অনিশ্চয়ের পরিমাণ তাঁর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। তাঁকে 'নিহিলিস্ট'ও বলা যেতে পারে। এও Interregnum-এর লক্ষণ।

———

প্রমথ চৌধুরীর যুগ

॥ এক ॥

প্রমথ চৌধুরীকে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার 'জাগরণের' অবসানযুগের একজন ভাবনায়ক বলা যায়। ১৯১১ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রত্যাহার এবং ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী বদলেই স্বদেশী আন্দোলনের যথার্থ সমাপ্তি ধরা উচিত—বাঙলা দেশের মানসিক জাগরণের অবসানও শুরু হয় ঐ সময় থেকে। "সবুজ পত্র" ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়—ঐ পত্রের সম্পাদকরূপেই প্রমথ চৌধুরী শিক্ষিত বাঙালীর মনোজগতে কিছুদিনের জন্য আধিপত্য করেন। তাঁর আগে এমন কোনো নামজাদা লোক পাওয়া শক্ত যাঁকে বাঙালীর মানসিক জাগরণের অবসান-মুহূর্তের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

অনেকে একথা শুনলে বিস্মিত—কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হতে পারেন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সাহিত্যে কথ্যভাষা ব্যবহারের দ্বারা প্রমথ চৌধুরী বাঙলার জাগরণের একটি ধারায় অনেকখানি শক্তি সঞ্চার করেন। এই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ভুল বলা যায় না, কিন্তু অনেকেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন। অনেকেই ভুলে যান, প্রমথ চৌধুরী আমাদের সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার 'প্রবর্তক' নন। হুতোমের নক্‌শা, বিবেকানন্দের গদ্য, রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র—এগুলো সবই প্রমথ চৌধুরীর পূর্বগামী জিনিস। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি চল্‌তি ভাষার প্রথম ব্যবহারে নয়—রবীন্দ্রনাথকে সাধুভাষা ত্যাগের অনুপ্রেরণা দেওয়াতেই তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন চল্‌তি ভাষাকে স্বীকৃতি না দিতেন, তাহলে ও ভাষা আজো আমাদের মধ্যে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেত কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বাঙালীর মানসিক জাগরণে ভাষার দিকটাই একমাত্র দিক নয়; অন্যান্য দিকে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারায় আমাদের জাতীয় জাগরণের অবসান-লক্ষণ স্পষ্ট।

এমন কি চল্‌তি ভাষা সংক্রান্ত আলোচনাতেও তার ইঙ্গিত আছে। চল্‌তি ভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মতের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মতের তুলনা করলে একটা ন্যূনতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দও চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী,—কিন্তু তাঁর মতে, বুদ্ধ থেকে চৈতন্য পর্যন্ত যাঁরাই "লোকহিতায়" অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাই চল্‌তি ভাষায় শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ধর্মসম্পদকে সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যেই বিবেকানন্দের মতে চল্‌তি ভাষার প্রয়োজনীয়তা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষার বিরুদ্ধে রামমোহনের মতও প্রায় এই। তাছাড়া "লোকহিতায়" কথাটাও লক্ষ্য করবার মতো,—এও ১৯শ শতাব্দীর একটা বাঁধা বুলি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী জোর দিয়েছিলেন ভাষার 'সরলতা' ও 'প্রাঞ্জলতার' উপর। এও খুব দামী কথা সন্দেহ নেই,—ভাষাঘটিত লোকহিতের উপাদানও তাই—কিন্তু আমরা জানি, খবরের কাগজের চুটকিও 'সরল', বাজারে রম্যরচনাও 'প্রাঞ্জল'। এই অখাদ্য জিনিসগুলো কেবল একটি গুণের দ্বারাই সুখাদ্য হতে পারে—সে হচ্ছে বাক্‌চাতুর্য। এ দিক দিয়ে দেখলে বাকৃচাতুর্যকেই গদ্যরীতিক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব দান বলতে হয়,—১৯শ শতাব্দীর লেখকরা এ গুণটার উপর জোর দেননি। 'সরলতা' ও প্রাঞ্জলতা' প্রমথ চৌধুরীর নিজের দান নয়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই এ দুটো গুণের গুণকীর্তন করেছিলেন,—এবং কার্যতঃ 'বাকৃচাতুর্যকে' 'লোকহিতের' চেয়ে বড় স্থান দিয়ে ১৯শ শতাব্দীর ভাষা-আদর্শকে খাটো করে দিয়েছিলেন। তবে বাক্‌চাতুর্যের উপর জোর দেওয়ার ফলেই প্রমথ চৌধুরীর নিজের রচনা ছাড়া 'শেষের কবিতা' ও 'দৃষ্টিপাতের' মতো রচনা আমরা পেয়েছি,—এ দিক থেকে সমস্ত বাঙালী পাঠক তাঁর কাছে ঋণী।

॥ দুই ॥

প্রমথ চৌধুরীর ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত মতামতেও আমরা একটা অভাব টের পাই, এখানেও তিনি বাঙলার জাগরণের ভাবধারা থেকে দূরে সরে আসছিলেন।

এইখানে মনে রাখতে হবে বাঙলার জাগরণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদেরই কীর্তি। প্রমথ চৌধুরী ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারারই অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ব্রাহ্ম ভাবধারার অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি তার থেকে বিচ্যুতির পথটাই প্রশস্ত করেছিলেন।

রামমোহন সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, প্রাচীন ভারতের "কস্‌মিক কনশাসনেস"-এর আবিষ্কার রামমোহনের কীর্তি।—এই উক্তিটাকে আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমর্থনসূচক বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যখন আরো বলেন :

"এ বিশ্বের অর্থ কী, এর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী, সে সম্বন্ধ ইহকালের কি অনন্তকালের—এই শ্রেণীর প্রশ্নের মূল হচ্ছে কস্মিক কনশাসনেস"—তখন হঠাৎ একটা সন্দেহের কাঁটা আমাদের মনে খচখচ করে ওঠে। রামমোহন কোনো পুস্তকেই বিশ্বের অর্থ এবং মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেননি। উপনিষদ যে পরব্রহ্মের কথা বলেন, যে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, রামমোহনের মতে সেই সর্বনিয়ন্তার প্রতিমাবর্জিত উপাসনাই মানুষের পরম কর্তব্য। এইটেই প্রাচীন ভারতের "কস্মিক কনশাসনেস" কি না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যখন এর সঙ্গে বিশ্বজাগতিক জল্পনা-কল্পনাকে জড়িয়ে ফেলেন, তখন অস্বস্তির কারণ ঘটে ; এই সমস্ত কথার মধ্যে একটু নাস্তিক-নাস্তিক গন্ধ পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর ব্রাহ্মধর্মব্যাখ্যা সম্বন্ধে এইটেই প্রথম আপত্তি।

দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর সামাজিক মতামত সম্বন্ধে। এখানেও প্রমথ চৌধুরী রামমোহনের উপর এমন কতকগুলি মত আরোপ করেছিলেন যেগুলো ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহনের মত কিনা সন্দেহ।

॥ তিন ॥

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন : ভারতে ইউরোপের 'সোশাল কনশাসনেস' প্রচার করা রামমোহনের আর এক কীর্তি। তাঁর মতে, এই 'সোশাল কনশাসনেস' হচ্ছে

লিবারেল ভাবধারা : লিবার্টির মন্ত্রই যে ভারতের সঞ্জীবনী মন্ত্র হবে রামমোহন নাকি তা জানতেন। দুঃখের বিষয় প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তিটাও অসত্য বা অর্ধসত্য। 'লিবারেল' ভাবধারার একটা বিশেষ দিক (রাজনৈতিক দিক) ছাড়া আর কোনো দিকে রামমোহনের আগ্রহ ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।* একথা ঠিক 'লিবারেল' শব্দটা আমরা এত অস্পষ্ট ভাবে প্রয়োগ করি—(এমন কি ব্রাহ্মরাও হয়তো করতেন) যে, প্রমথ চৌধুরীর কথাটাকে অনেকেই নির্দোষ ভাবতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের 'সমাজচেতনা'কে 'লিবারেল সমাজচেতনা' বললে একটা মৌলিক প্রভেদকে অস্বীকার করা হয়। রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজের 'সমাজ চেতনার' মূল প্রেরণা ছিল 'ধর্মের উন্নতি'—'লিবার্টি বা ব্যক্তিস্বাধীনতা' নয়। 'ধর্মের উন্নতি' আর 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'কে যাঁরা গুলিয়ে ফেলেন তাঁরা ভুল করেন। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে এ-দুটির সম্পর্ককে ঠিক সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক বলা যায় না, অহি-নকুল সম্পর্ক বললেই বরং ঠিক বলা হয়।

আধুনিক ইউরোপে 'লিবারেল সমাজচেতনার' বহুবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্টেটস্‌ম্যান কাগজের এক বিবরণে প্রকাশ :

"পশ্চিম জার্মানির উচ্চতর পরিষদে স্ত্রী-পুরুষের মিলননীতি সম্পর্কে কতকগুলি নতুন আইন পাশ হয়েছে। এই বিধানের ফলে দল বেঁধে কামসেবা (Group sex), স্ত্রী বদলাবদলি (Wife-swapping) এবং অশ্লীল সাহিত্যের বেচাকেনা আইন-সম্মত হল।···১৮ বছরের উর্ধ্বে পুরুষদের মধ্যে পুংমৈথুন (homosexuality) এখন থেকে আর দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে না। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যদি তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কামক্রীড়া করে, তবে আইন তাতে কোনো বাধা দেবে না। নতুন আইনে নিজের দায়িত্বে কামসেবার বয়স (The age of sexual responsibility) একুশ থেকে আঠারোয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষোল থেকে

* এইজন্য দেখা যায় রামমোহনের যুগেই একটা বিদ্রূপাত্মক কথার সৃষ্টি হয়েছে—"হাফ্-লিবারেল"। ডিরোজিওপন্থীরা এই শব্দটা দিয়ে রামমোহনপন্থীদের ব্যঙ্গ করতেন।

চৌদ্দয় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কেবল মা-বোনের সঙ্গে কামসেবার নিষেধ (Incest) বজায় থাকবে, কিন্তু যারা কেবল বিবাহসূত্রে আত্মীয় ('Relations by marriage'—ভাদ্দর-বৌ, খুড়ী, জেঠি ইত্যাদি) তাদের সঙ্গে কামক্রীড়ায় এখন থেকে আর বাধা নেই।

আইনমন্ত্রী গেরহার্ট ইয়ান বলেন: "নতুন আইন কেন করেছি?—না, আমরা ১৯শ শতাব্দীর ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আমরা চাই যে, কামক্রীড়ার বিধিব্যবস্থা আরো বেশি উদারনৈতিক মূলের (Liberal principles) উপর প্রতিষ্ঠিত হোক।" (স্টেট্‌সম্যান, ১১।১১।৭৩)

এই হচ্ছে 'লিবারেল সমাজচেতনার' দৃষ্টান্ত। পশ্চিম জার্মানির আইনমন্ত্রীর এই 'লিবারেল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌' এবং ব্রাহ্মদের 'সমাজচেতনা' যে এক জিনিস নয়, এটুকু বুঝতে আইনস্টাইনের মগজ দরকার করে না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রমথ চৌধুরী 'ব্রাহ্ম' সমাজচেতনার গোড়ার কথাটাই বোঝেননি। রামমোহন ও ব্রাহ্ম-সমাজ ধর্মের দিক দিয়েই সমাজের কল্যাণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁদের সমাজচেতনার মূল কথা ছিল, 'ধর্মের উন্নতি'; 'লিবারেল সমাজচেতনা'র মূল কথা হচ্ছে, কামক্রীড়া এবং অন্যান্য ব্যাপারে ব্যক্তির সুখভোগের পথকে বাধামুক্ত করা। দুটোতে তফাত অনেক।

॥ চার ॥

প্রশ্ন উঠতে পারে: তাই না হয় হোলো, কিন্তু তাতে প্রমথ চৌধুরীর অগৌরব কী? তিনি কোনকালেই ঐতিহাসিক ছিলেন না, কাজেই ব্রাহ্ম ভাবধারার তিনি যদি ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাতে কী আসে যায়? যাঁর খ্যাতি মূলতঃ সাহিত্যিকরূপে, তাঁকে নিয়ে এ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা কেন?

আলোচনার কারণ, স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) পর থেকে বাঙলার সমাজ ও সভ্যতাঘটিত ভাবধারায় যে হাওয়াবদলের সূচনা হয়—এই সমস্ত মতামতে আমরা তার প্রথম অস্ফুট পদসঞ্চার শুনতে পাই। "ধর্মজাগরণ বড়

জিনিস নয়—,বড় জিনিস হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক নিয়ে তর্কবিতর্ক"; "ধর্মাশ্রিত সামাজিক ভাবধারা বড় জিনিস নয়, বড় জিনিস হচ্ছে ব্যক্তিমানুষের লিবার্টি বা স্বাধীনতা"—এসব মত প্রাক্‌স্বদেশী যুগের বাঙালীদের নয়।* আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এসব মত ব্রাহ্মসমাজেরও নয়, 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু'দেরও নও—তাঁরা কেউই এসব মতের খাতিরে ধর্মজাগরণ এবং ধর্মাশ্রিত সামাজিক ভাবধারাকে ছোট করে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে ধর্মজাগরণ এবং ধর্মাশ্রিত সামাজিক ভাবধারা নিয়েই "বেঙ্গল রেনেসাঁস" এবং ব্রাহ্ম ও 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা' সেই রেনেসাঁসের নায়ক। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর মতামতে আমরা "বেঙ্গল রেনেসাঁসের" 'পতনের' সূচনা দেখতে পাই—এইটেই আমার বক্তব্য।

কিন্তু আরেকটা কথা এর চেয়ে বড়। সন্দেহ নেই, প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতি প্রধানতঃ সাহিত্যিকরূপে। কিন্তু একদিকে যেমন তাঁর লেখায় 'বেঙ্গল রেনেসাঁসের' ধর্মাশ্রিত ভাবধারার পতনের সূচনা আছে, আরেকদিকে তেমনি আজকালকার বাঙলার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার আভাসও তাতে আছে। অনেকে এই নূতন ভাবধারাকে খুব বড় জিনিস মনে করেন। তাঁরা মনে করেন : এই নূতন ভাবধারার দ্বারাই আমরা সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পথ দেখতে পাবো। কিন্তু এ বিশ্বাস সত্য কিনা সন্দেহ। এখানেও প্রমথ চৌধুরীর জীবন থেকে আমরা কিছু সঙ্কেত পেতে পারি।

---

* এমন কি প্রাক-স্বদেশী যুগের ইউরোপীয়দেরও নয়। প্রমথ চৌধুরী যেরকম সর্বজ্ঞের ভঙ্গিতে 'লিবার্টি'কে ইউরোপের 'সোশাল কনশাসনেস' বলে রায় দিয়েছেন তা দেখে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্মিতহাস্য করতেন। ১৯শ শতাব্দীর ইউরোপের 'সোশাল কনশাসনেস'-এর উপর 'ক্রীশ্চান কনশেন্স'-এর প্রভাব কম নয়। এমন কি রামমোহনও সেই 'কনশেন্স'-এর দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া প্রমথ চৌধুরী যখন তাঁর প্রবন্ধ লিখছেন তখন লিবার্টির পীঠস্থান ইংলণ্ড থেকেও লিবারেল পার্টির আসন টলমল করে উঠেছে। আজকের ইউরোপের 'সোশাল কনশাসনেস' কি 'লিবার্টি' না 'সোশাল জাস্টিস' ?—প্রমথ চৌধুরী এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন বোধ করেননি।

॥ পাঁচ ॥

আজকাল কথা উঠেছে, মানুষের জীবনে ধর্ম কিছু নয়, জাতিধর্মনিরপেক্ষ 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'ই সব। প্রমথ চৌধুরীকে বাঙালী সমাজে এই তত্ত্বের একজন আদি প্রচারক বলা যায়। যাঁরা ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাস জানেন, তাঁরা জানেন সে-যুগে 'সংস্কৃতি', 'বৈদগ্ধ্য' প্রভৃতি শব্দের চলন হয়নি। সে-যুগে মানুষের মনুষ্যত্ব যাচাই হত ধর্ম দিয়ে বা প্রতিভা দিয়ে, 'সংস্কৃতি' দিয়ে নয়। প্রতিভা দিয়ে যাচাই অবশ্য এখনও হয়। কিন্তু আজকাল আমরা কে কতটা ধার্মিক তার বিচার করি না,—দেখি কে কতটা বিদগ্ধ বা সংস্কৃতিবান্। সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য দামী জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে এগুলোকে ধর্মছাড়া করে সমাদর করা হত না কেন? সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য দূরে থাক, প্রমথ চৌধুরীর লেখার (বা চরিত্রের) যে গুণটুকুর প্রশংসা প্রত্যেকেই করেন (আমরাও করেছি) সে-যুগে সেই 'বাক্‌চাতুর্যের'ও পৃথক সমাদর হত না কেন? প্রথমে এ প্রশ্নটার একটু আলোচনা করা যাক।

আমি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর অনুরাগের কথা বলেছি।—অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, বাক্‌চাতুর্য সে-যুগের ব্রাহ্ম লেখকদের বড় গুণ নয়। "হে ভারতবাসী, আইস আমরা নিরাকার পরব্রহ্মের ভজনা করি, বিধবাদিগকে বিবাহ দিই, বামাগণকে কালেজে পাঠাই"—এমন ভাষা সে-যুগের অনেক ব্রাহ্ম লেখকের লেখাতেই সুলভ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের এত অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও এমন ভাষা কখনো প্রমথ চৌধুরীর কলম থেকে বেরিয়ে কাগজের শোভাবর্ধন করেনি। প্রশ্ন হচ্ছেঃ কেন করেনি? ব্রাহ্ম-সাধারণের তুলনায় তাঁর কলমের এই যে স্বাভাবিক উৎকর্ষ এর কি কোনো বিশেষ মানে আছে?

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, আছে। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরীর লেখার এই গুণটুকু সম্পূর্ণ গুণ নয়, এবং ব্রাহ্মভাষার এই দোষটুকু সম্পূর্ণ দোষ নয়। ব্রাহ্ম নেতাদের চরিত্রগৌরবের কথা মনে রাখলে ব্রাহ্মভাষার এই অতিসরলতা এমনকি কথঞ্চিৎ গ্রাম্যতা মোটেই দোষের নয়;—পালিশ-করা

ভাষাই বরং সেক্ষেত্রে দোষের হত। এমনও বলা যায়, দেশে যখন ধর্মভাবের আন্তরিকতা থাকে তখন লোকে ভাষাব্যবহারক্ষেত্রে বাক্‌চাতুর্যের উপর জোর দেয় না, জোর দেয় পবিত্রতা ও লোক-কল্যাণ-ক্ষমতার উপর। বিপরীতক্রমে দেশে যখন ধর্মবিশ্বাসের আন্তরিকতা কমে আসে, নীতির বিশুদ্ধি-রক্ষায় উত্তেজিত হওয়া যখন ছেলেমানুষী বোধ হয়, তখন, ভাষায় বলুন, চরিত্রে বলুন, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় জিনিস হয়ে ওঠে 'চাতুর্য', 'বৈদগ্ধ্য', 'স্মার্টনেস'। কোনো মানুষই একেবারে নির্দোষ হয় না, কাজেই প্রমথ চৌধুরীরও সম্ভবত দুয়েকটা দোষ ছিল। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি 'স্মার্ট' ছিলেন, 'আর্বেইন' ছিলেন, 'কালচার্ড' ছিলেন। এই ইংরেজি কথাগুলো যে-যে ভাবের আভাস দেয় তার কোনোটাই ধার্মিক লোকের লক্ষণ বলে বিবেচিত নয়; কিন্তু কোনোটাকেই দোষ বলা যায় না। এগুলো যে গুণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং এই গুণগুলো দিয়েই আমরা প্রমথ চৌধুরীর যুগকে তাঁর পূর্বগামী ও পরগামী যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। এই গুণগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এগুলির প্রত্যেকটাই যদিও ধর্মহীনতার অবস্থা বোঝায়, কিন্তু অশ্লীলতা বোঝায় না, ইতরতা বোঝায় না, যথেচ্ছাচার বোঝায় না। আমাদের দেশের সাহিত্যে ও সমাজে আজকাল যে ইতরতা, অশ্লীলতা এবং যথেচ্ছাচার দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরীর জীবিতকালেই তার সূত্রপাত হয়। কিন্তু 'সবুজ পত্রের' যুগ ইতরতা, অশ্লীলতা, ও যথেচ্ছাচারের যুগ নয়। আমরা শুধু এই দেখতে পাই যে ঐ সময় থেকে হাওয়ার বদল হয়েছে, ব্রাহ্ম নেতাদের চরিত্রগৌরবের প্রভাব কমে গেছে; হেরম্ব মৈত্রের মতো নীতিজ্ঞান হাসাহাসির বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবল যে উন্নতচরিত্রের ব্রাহ্মের সংখ্যা কমে আসছে তাই নয়, উন্নতচরিত্র 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর' সংখ্যাও কমে আসছে —ধর্ম বা দেশের জন্যে সর্বস্বত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ শিক্ষিত লোকের কাছে বিদ্রূপের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী এই 'পরিবর্তন যুগের' প্রতিনিধি: এইজন্যই 'কস্মিক কনশাসনেস'-এর মতো নাস্তিক স্লোগান তাঁর কাছে ধর্মবিশ্বাসের

মাপকাঠি, ভদ্রতা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নৈতিক গুণ, শ্লেষ বা বাকচাতুর্য তাঁর কাছে সাহিত্যিক স্টাইলের পরাকাষ্ঠা। প্রমথ চৌধুরীর যুগ ধর্ম, নীতি ও কবিত্বের ক্রমবর্ধমান শুষ্কতার যুগ, কিন্তু অসভ্যতার যুগ সেটা নয়।

॥ ছয় ॥

তা নাই হোক, কিন্তু অসভ্যতার যুগ না হলেও ঐ যুগের যা সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি তার অন্ততঃ একটা দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর জীবনকে আশ্রয় করেই জন্মলাভ করেছিল। আগেই ইঙ্গিত করেছি, তাঁর সময় থেকেই বাঙলা সাহিত্যে একটা নূতন জিনিস দেখা দিল। ধর্মজাগরণের বংশীধ্বনি গেল নীরব হয়ে, তার জায়গায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের জয়গান। এটা যে কত বড় ট্রাজিডি আমরা সেটা ভেবে দেখি না। রামমোহন রায় থেকে বিবেকানন্দের কাল পর্যন্ত বাঙলা দেশে যে ধর্মজাগরণের স্রোত বয়েছিল আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবনে তার প্রভাব বড় কম ছিল না। সে-প্রভাবের শেষ ও সার্থকতম পরিণতি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে—যে গান আজও আমাদের নিঃস্ব, রিক্ত, শতেক লাঞ্ছনাজড়িত বাঙালী জীবনের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। কিন্তু আজকাল আমরা যখন ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদের ধর্মসঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে বাঙালী জীবনের লাঞ্ছনা থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তখন কি একবারও ভেবে দেখি—যে ধর্মভাবদীপ্ত পরিবেশ থেকে ঐ সঙ্গীত নিঃসৃত হয়েছিল, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের নামে আমরা আজ কতকগুলি লাম্পট্যভরা গল্প-উপন্যাস, কুৎসিত আধুনিক গান এবং ততোধিক কুৎসিত সিনেমা-জলসার চর্চা করতে করতে সেই পরিবেশকে স্বহস্তে গলা টিপে মেরেছি? আমরা কি একবারও চিন্তা করি, প্রমথ চৌধুরীর কাল থেকে বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙালী-জীবনে যে ধর্মবিমুখ ভাবধারার সূত্রপাত হল তার মধ্যে কত বড় ট্রাজিডির বীজ নিহিত ছিল? প্রমথ চৌধুরীর পত্নী ইন্দিরা দেবীর জীবনকে আমরা ঐ ট্রাজিডির

অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে দেখতে পারি। তাঁর নিজের জীবনে কোনো ট্রাজিডি ছিল কিনা বলতে পারি না। বোধ হয় ছিল না। কারণ চরিত্রের দিক দিয়ে যারা 'আর্বেইন', 'কালচার্ড' এবং 'সফিস্টিকেটেড্' তারা যেমন ধর্ম থেকে অনেক দূরে বাস করে, তেমনি ট্রাজিডি কথাটা তাদের জীবনে একেবারেই বেমানান। অন্ততঃ প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীতে ট্রাজিডির বিন্দুবাষ্পও নেই। আমরা সেগুলির মার্জিত বৈদগ্ধ্য, স্বাভাবিক বুদ্ধির তীক্ষ্নতা এবং বাক্যপ্রয়োগের শ্লেষাশ্রিত চাতুর্য উপভোগ করি, কিন্তু আনন্দ বা বেদনার জন্য আমরা কেউ প্রমথ চৌধুরীর দ্বারস্থ হই না। লেখক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল মধ্যশ্রেণীর। জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি হয়তো কমেডির নায়ক হতে পারতেন কিন্তু ট্রাজিডির নায়ক হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।—ইন্দিরা দেবীর সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

দুঃখের বিষয় এই উক্তির প্রমাণে আমাদের কিঞ্চিৎ অনুমানের আশ্রয় নিতে হবে। ইন্দিরা দেবীর কোনো জীবনকথা আজো লেখা হয়নি। এম্‌নিতেই জীবনীর দিক দিয়ে আমাদের বাঙলা সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র; তার উপর কোনো স্বল্প-প্রতিভাযুক্ত মহিলার জীবন নিয়ে কালক্ষেপ করা বাঙালী লেখকেরা নিরর্থক বিবেচনা করেন। কাজেই এই ট্রাজিডির বিশদ বর্ণনা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু দুটো বড় তথ্য আমাদের জানা আছে।—ইন্দিরা দেবী একটা ধর্মভাবাশ্রিত পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় হয়েছিলেন, কিন্তু বিবাহসূত্রে তিনি এমন একটা পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যাতে 'সংস্কৃতি' থাকলেও ধর্ম ছিল না। এর দ্বারা তাঁর 'চিত্তের পরিণতি দ্বিখণ্ডিত' হবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। এটা হয়তো আনুমানিক কথা;—কিন্তু ইন্দিরা দেবীর বিশ্ববিখ্যাত পিতৃব্য তাঁর জীবনে যেরকম সার্থকতা আশা করেছিলেন, সেরকম সার্থকতা যে তিনি পাননি, এটা মোটেই আনুমানিক কথা নয়, এর অনেক প্রমাণ আছে।

সকলেই জানেন ইন্দিরা দেবী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের সন্তান এবং এও সকলে জানেন বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে এই পরিবারের ভূমিকা কত বড়। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে এ পরিবার 'সংস্কৃতিকে' ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করবার কথা

ভাবেননি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূত চরিত্রের ছায়ায় এ পরিবারে যে ধর্মোদ্দীপনা এসেছিল ইন্দিরা দেবীর শৈশবে তার ছাপ পড়েনি একথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ আছে 'ছিন্নপত্রে'—রবীন্দ্রনাথ সেখানে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বাঙালী হিন্দুঘরের আদর্শ মহিলারূপে দেখতে চেয়েছিলেন। এই আদর্শকল্পনার সুস্পষ্টতম পরিচয় পাই 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটা কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে অত্যন্ত সাদা-মাটা ধর্মের ভাষায় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন ঃ

মা আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা
মানবেরে জ্যোতি দাও করো আশীর্বাদ
অকলঙ্ক-মূর্তি মধুরিমা।

লিখেছিলেন ঃ

পুণ্যজ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি
অন্নপূর্ণা-জননী সমান
মহাসুখে সুখদুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখ শান্তি দান।

লিখেছিলেন ঃ

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ
পড়ুক দুফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।

আরো লিখেছিলেন ঃ

আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ
হৃদয়েতে উষার আভাস
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন
চারিদিকে মর্তের প্রবাস।

সবশেষে লিখেছিলেন :

সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ কর মা, গ্রহণ।

এই কবিতাগুলির অর্থ এতই প্রাঞ্জল যে তা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশ নেই। ইন্দিরা দেবী তাঁর পরিবারের মনে, বিশেষ করে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী পিতৃব্যের মনে কিরকম আশার সঞ্চার করতেন এই কবিতাগুলিতে তার স্পষ্ট পরিচয় আছে, একটি ধর্মভাবদীপ্ত চরিত্রের ছবি আছে। আশ্চর্যের বিষয় 'ছিন্নপত্রাবলী'র পুরোভাগে আমরা আজকাল কুমারী ইন্দিরার যে ছবি দেখতে পাই, সেটা ঠিক এই ছবি। সুন্দরী মেয়ের ছবি বটে, কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের চেয়ে বেশি কিছু আছে। 'স্বর্গীয় সৌন্দর্য' কিংবা ঐ রকম কিছু বহু-ব্যবহার-মলিন ধর্মাশ্রিত ভাষার সাহায্যেই সেটা বর্ণনা করা যায়। কাজেই অনিবার্য ভাবেই একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—ইন্দিরা দেবী কি তাঁর পিতৃব্যকল্পিত এবং তার নিজের প্রতিকৃতির দ্বারা প্রতিবিম্বিত প্রত্যাশার অনুরূপ সার্থকতা পেয়েছিলেন ?

বোধ হয় পাননি। বোধ হয় কেন, নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আশা সফল হয়নি। তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে 'অন্নপূর্ণা-জননী' কিংবা 'লক্ষ্মীর প্রতিমা'র আসন অলঙ্কৃত করেননি। তাঁর সকরুণ দৃষ্টি থেকে নির্গত করুণাধারা এদেশের মানুষকে 'বাল্মীকির শ্লোকের' মতো অনুপ্রাণিত করেনি, তার কারণ বিয়ের পর তিনি 'ড্রয়িং রুমের' জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন, তাতে যদি কোনো সার্থকতা পেয়ে থাকেন সে ইতিহাস আমাদের কাছে এসে পৌছয়নি। 'নারীর উক্তি' সুলিখিত বই, কিন্তু সেটা বাল্মীকির শ্লোক নয়।

বরং কিছু বিপরীত সাক্ষ্যই এসে পৌছেছে। ইন্দিরা দেবীর শেষ বয়সের চেহারা যাঁরা ছবিতে বা স্বচক্ষে দেখেছেন, তারা সে চেহারাকে তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র যুগের ছবির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে ব্যথিত, বিস্মিত এবং বিমূঢ় হয়েছেন। হবারই

কথা, কেননা দেখা যাচ্ছে, এক অপূর্ব লাবণ্যবতী যুবতী সহসা এক অতি কদাকার বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে, একজন লেখক, বয়সের সঙ্গে নারী-সৌন্দর্যের যে নিদারুণ সম্বন্ধ, সেই প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে বিলাপ করেছেন। কিন্তু কেউ ভেবে দেখেননি এর একটা অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে। যে শূন্যতা ও শুষ্কতা আমাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী, কেবলমাত্র ধর্মই যে শূন্যতা ও শুষ্কতার পূরণ করতে পারে, কেউ ভেবে দেখেননি, মানুষের দৈহিক রূপান্তরে তারও কিছু হাত থাকতে পারে। ইন্দিরা দেবীর ক্ষেত্রে এ সন্দেহ স্বাভাবিক, কেননা তিনি এক জীবনেই দুটো বিপরীত স্রোতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেখানে 'অন্নপূর্ণা-জননী' 'লক্ষ্মীর প্রতিমা', প্রভৃতি শব্দের মহিমা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, কিন্তু 'ড্রয়িং রুমের' জীবনে এ-সব কথা সাংস্কৃতিহীন গ্রাম্যতার প্রতীক মাত্র। তা ছাড়া, 'মেয়েদের রূপ দুদিনের জিনিস'—এই জরাজীর্ণ মামুলি সত্য দিয়ে কি সব রূপান্তরের ব্যাখ্যা হয়? মেয়েদের রূপ বয়সের চাপে যতই মলিন হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, শেষ বয়স পর্যন্ত তাতে "পূর্বলাবণ্যের চিহ্নসকল" বিদ্যমান থাকে, সূক্ষ্মদর্শীর চোখকে তারা ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু ছিন্নপত্রের যুগের ছবিটি দেখবার পর বর্ষীয়সী ইন্দিরার ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে যে কেউ বলবেন: কেউ যেন এখানে একটা নতুন মুখ বসিয়ে দিয়েছে, আগের মুখটাকে নিয়ে গেছে চুরি করে। এই নতুন মুখ দেখবার পর, পূর্বোক্ত জরাজীর্ণ ও মামুলি সত্যটার বদলে আমরা একটা নূতন সত্য উপলব্ধি করতে পারি। তখন বুঝতে পারি: অনেক কিছুর মতো দৈহিক সৌন্দর্যও যুগ-নিরপেক্ষ বা কাল-নিরপেক্ষ জিনিস নয়। যখন দেশে একটা প্রবল ও চিত্তজাগরণকারী ধর্মভাবের স্রোত বইতে থাকে তখন মানুষের মুখেও তার ছায়া পড়ে—কুৎসিত মানুষও হঠাৎ রূপবান হয়ে ওঠে। বিপরীতক্রমে, ধর্মভাবের স্রোত যখন মজে যায়, অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত মুখও তখন দুর্যোগের দংষ্ট্রাঘাতকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—বয়সের কালো দাগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসে যুগাবসানের দীর্ণরেখা। কাজেই ইন্দিরা দেবীর মুখশ্রীতে শেষ বয়সে যে বিকৃতি ঘটেছিল, সে হয়তো যুগ পরিবর্তনের

দংষ্ট্রাচিহ্ন মাত্র—বাঙলার ধর্মজাগরণের স্রোত তখন মজে আসছিল। তাঁর স্বামীর ধর্মহীন সংস্কৃতিচর্চাও এ অবস্থার জন্য কতকটা দায়ী, কাজেই তাঁর দেহেমনে যুগাবসানের অভিঘাত খুব নিকট থেকে লাগবার সম্ভাবনা ঘটেছিল। অবশ্য এ সবই অনুমান,—দৈহিক রূপান্তরের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার চেয়ে এ অনুমানের জোর বেশি, এমন দাবিও আমি করতে চাই না। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর ধর্ম-বিশ্বাসহীন ভাবধারা গত পঞ্চাশ ষাট বছরে আমাদের জাতীয় জীবনের যে সর্বস্তরব্যাপ্ত সর্বনাশের কারণ হয়েছে, বাঙলার ধর্মজাগরণের অবসানলগ্নে কোথাও তার একটা নাটকীয় আভাস পড়েনি, একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। ইন্দিরা দেবীর দৈহিক পরিবর্তনে আমি সেই নাটকীয় আভাস, সেই ট্রাজিডির আভাস দেখতে পাই, এবং প্রমথ চৌধুরীকে বাঙলা সাহিত্যের যে 'প্রগতি' ঘটিত বিপ্লবের পুরোধারূপে দেখা হয় আমার মতে এই ট্রাজিডিই তার বৈপ্লবিকতা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত 'কমেণ্টারি'।

মোহিতলাল মজুমদার

॥ এক ॥

স্বদেশী আন্দোলনের পরে শিক্ষিত বাঙালীর মনোজগতে হঠাৎ যে পরিবর্তন দেখা দেয় মোহিতলাল মজুমদারের জীবন সেই যুগ-পরিবর্তনের এক বড় দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনের সবচেয়ে শোকাবহ এবং সবচেয়ে কৌতুককর জিনিস এই যে, তিনি নিজেকে সব সময়ই ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার মানসিক জাগরণের একজন প্রতিনিধি ভাবতেন, এবং ঐ যুগের ভাবধারা থেকে বিংশ শতাব্দীর বাঙালীদের যে বিচ্যুতি বা স্খলন, তার বিরুদ্ধে অনবরত লড়াই দিয়েই তাঁর জীবন শেষ হয়। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কখনোই বুঝতে পারেন নি যে, তিনি নিজে সারাজীবন সেই বিচ্যুতির পথ প্রশস্ত করতেই ব্যাপৃত ছিলেন। আত্মবিভ্রমের এই কৌতুককরতার দিক দিয়ে তিনি অনেকদূর পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তুলনীয়—তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর জীবনেও এইরকম একটা বিভ্রম লক্ষ্য করা যায়। দুজনের মধ্যে তফাত এই যে, প্রমথ চৌধুরী যদিও ১৯শ শতাব্দীর ভাবধারার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোলে হরিবোল দিতেও তিনি ভোলেননি। মোহিতলাল এই জিনিসটাই পারেননি, এবং সেইজন্যই তাঁর পরিণাম এত মর্মান্তিক হয়েছিল।

॥ দুই ॥

প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদার অল্প কয়েক বছরের তফাতে বাঙলা সাহিত্যে আসেন, এবং স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে স্বাধীনতার যুগ পর্যন্ত এ দুই-জনের ভাবধারাই বাঙলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত এবং অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। সন্দেহ নেই, বাঙলা ভাষার

সবচেয়ে ভালো বইগুলি তখনও পর্যন্ত তিনিই লিখেছিলেন।—কিন্তু সাহিত্য রচনার পিছনে যে-সব মত ক্রিয়া করে, সাহিত্যিক সৌন্দর্যসৃষ্টি বা সাহিত্যের নীতি-বিষয়ক যে-সব ধ্যানধারণা নিয়ে লেখকরা সাহিত্য লেখেন, সে-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর জীবদ্দশাতেই গৌণ হয়ে পড়ে। একথা মানতেই হবে, মোহিতলাল ও প্রমথ চৌধুরী বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে যে-সব নূতন ভাবের বীজ বপন করেন তার থেকে কোনো (সাহিত্যিক) বনস্পতির উদ্গম হয়নি। কিন্তু আর কিছু না হোক, শুধু কেবল স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দেখলেও এই নূতন ভাবধারার বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। তার কারণ আজকের লেখকরাও সাহিত্যনীতির ব্যাপারে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মোহিতলাল ও প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য,—বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের শিষ্য নন।

প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলালের সৃষ্ট এই নূতন ভাবগুলো কী? এক কথায় বলা যায়, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের পিছনে যে 'ক্রীড্' আছে—এ দুইজন লেখক সেই ক্রীডের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর লেখায় এই ক্রীডের একটা অস্পষ্ট আভাস আছে মাত্র, মোহিতলাল-ই এটাকে একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এই 'ক্রীডের' পর্যালোচনা করলে দেখা যায়ঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্র যুগের সাহিত্যিক ভাবধারার সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকের মনের যোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আরো ব্যাপকভাবে বলা যায়, আমরা যাকে বাঙলার জাগরণ বা রেনেসাঁস বলি তার সঙ্গেই আমাদের যোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে—সাহিত্য এই ক্ষীণতার একভাগের দৃষ্টান্ত মাত্র।

কী সেই 'ক্রীড্'? সংক্ষেপে বলা যায়ঃ মোহিতলালের মতে সাহিত্য একটা ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানযোগ। আমাদের ধর্মে যেমন ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নানা যোগের কথা আছে, মোহিতলালের মতে সাহিত্যও তেমনি একটা স্বতন্ত্র যোগসাধনার পথ। তবে এ সাধনা ঈশ্বরলাভের উপায় নয়—এটা জীবন সম্বন্ধে একটা গভীরতর, একটা উদারতর দৃষ্টিলাভের উপায়। মোহিতলালের মতে সাহিত্যের জগৎ নীতিধর্মের জগৎ নয়, অর্থাৎ সাহিত্যনীতি

ধর্মনীতি নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে : তবে কি এখনকার বাঙলা সাহিত্যে যে দুর্নীতি-মূলক কামকেলির ছড়াছড়ি দেখা যায়, মোহিতলাল তারও সমর্থন করতেন ? না, তা তিনি করতেন না। তাঁর মতে সাহিত্য যেমন ধর্মলাভের ব্যাপার নয়, তেমনি দুর্নীতির স্থানও তাতে নেই। তাঁর মতে সাহিত্য কেবল সুনীতিনিরপেক্ষ নয়, দুর্নীতিনিরপেক্ষও বটে।

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, মোহিতলালের এই মত সুনীতি-দুর্নীতি দুয়ের পক্ষেই সমান অকেজো। এর দ্বারা লাঠি আ-ভাঙা থাকতে পারে, কিন্তু সাপেরও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সাহিত্যে মানুষের ক্রিয়াকলাপই বর্ণিত হয়, এবং সে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে নীতির কথা না উঠে পারে না। একথা ঠিক, একটা ফুলের সৌন্দর্য নিয়েও সাহিত্য লেখা যায় এবং সে লেখার মধ্যে নীতির কথা নাও উঠতে পারে—কিন্তু মানবসম্বন্ধের ক্ষেত্রেও নীতির কথা উঠবে না—এটা অসম্ভব কথা। ওথেলো যে দেসদিমোনাকে হত্যা করেছিল—সে কাজ অতি নিষ্ঠুর দুষ্কার্য বলেই ওথেলো নাটক ট্রাজিডি হয়েছে, এবং এই দুষ্কার্যের বোধটা নৈতিক বোধ। দেসদিমোনার স্বামিনিষ্ঠা, ওথেলোর সরলবিশ্বাসে ভরা বীরহৃদয় এবং পঞ্চমাঙ্কের সেই অতি ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম—এই প্রত্যেকটি উপাদানই নৈতিক উপাদান এবং এই প্রত্যেকটি উপাদানের ধর্মনীতিগত উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে আমরা সজাগ বলেই এ ট্রাজিডি আমাদের কাছে এত মর্মস্পর্শী। এমন পাঠক কল্পনা করা যায় যার কাছে দেসদিমোনার হত্যা সৎকর্মও নয়, অসৎকর্মও নয়। কিন্তু তার কাছে ওথেলো নাটকও কি কতকগুলি অর্থহীন বাক্যপরম্পরা নয় ? মোহিতলাল বলতেন : তা হোক, কিন্তু দেসদিমোনার হত্যাকে দুষ্কর্ম বলে মানলেও শেক্‌স্‌পীয়র কোনো নীতিকথা প্রচার করেননি ;—সাদা কথায়, শেক্‌স্‌পীয়র প্রচারক ছিলেন না। ঠিক কথা ; কিন্তু এও তো দেখা যায়, শেক্‌স্‌পীয়র যতই নীতিপ্রচারে বিমুখ হোন, তাঁর পাত্রপাত্রীরা একটা নীতির জগতেই বাস করছে, নীতির উল্লঙ্ঘনে সেখানে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হচ্ছে। মোহিতলালের মত মানলে বলতে হয় : শেক্‌স্‌পীয়র যদি

দুর্নীতির জগৎ সৃষ্টি করতেন, তাতেও দোষ হত না ;—শুধু কেবল নজর রাখতে হত যে দুর্নীতিটা যেন প্রচারের পর্যায়ে না দাঁড়ায়। তাই যদি হয়, তবে আজকের বাঙলা সাহিত্যে যাঁরা লাম্পট্য আর ব্যভিচারের লীলাখেলা দেখিয়ে পকেট ভারী করছেন তাঁরাই বা কী দোষ করলেন ? তাঁরাও তো বলেন আমরা কিছু 'প্রচার' করি না, আমরা শুধু 'দেখাই'। মোহিতলাল এ প্রশ্নটার জবাব দেননি। আধুনিক বাঙলার রিয়ালিস্টিক নভেলের প্রতি খড়্গহস্ত হয়েও তিনি লক্ষ্য করেননি, তাঁর নিজের সাহিত্যিক ক্রীড্ দিয়েই ঐ নভেলকে সমর্থন করা যায়। যে সাহিত্যিক ক্রীড্ সুনীতি-দুর্নীতি দুদিক সম্বন্ধেই নিরপেক্ষ, তার গোড়ার গলদ তিনি কোনোদিনই বোঝেননি।

মোহিতলালের এই 'ক্রীড্' 'বাঙলার জাগরণের' সাহিত্যিক 'ক্রীডে'র বিপরীত ; অথবা ঠিক বিপরীত না হলেও এত বিভিন্ন যে মোহিতলালকে বাঙলার জাগরণের ভাবধারা থেকে বিচ্যুত বললে ভুল হয় না। বাঙলার জাগরণের সাহিত্যিক 'ক্রীডে'র স্রষ্টিকর্তা বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁর উত্তর-চরিত সমালোচনায় সে যুগের সাহিত্যাদর্শ ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায় ঃ বাঙলার জাগরণের সাহিত্যাদর্শ স্বভাবের অনুকারী সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ,—এমন সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ যা নীতিজ্ঞানের বিরোধী নয়, বরং নীতিধর্মকে যা গৌণভাবে রসদ জুগিয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের' প্রবন্ধগুলিতে এ 'ক্রীড্'কে আরো সম্প্রসারণ করেন—'সৌন্দর্যসৃষ্টি' ও 'নীতিজ্ঞানের' বদলে তিনি 'সৌন্দর্যসৃষ্টি' ও 'মঙ্গলের' কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কতটা গোঁড়া ছিলেন, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র কালিদাসের সঙ্গে শেক্স্পীয়রের তুলনায় সেটা বোঝা যায়। ঐ আলোচনায় ইউরোপীয় ট্রাজিডিকে তিনি স্পষ্ট করেই প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা তাঁর মতে ট্রাজিডির জগৎ অমঙ্গলের জগৎ। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে 'সেকেলে' ভাবার সুযোগ আছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে টি. এস. এলিয়ট যেভাবে দান্তে ও সেক্সপীয়রের তুলনা করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনাতেও এমন একটা ধারা আজো বজায় আছে, যা আমাদের জাগরণ যুগের সাহিত্যাদর্শের প্রতিকূল নয়। এলিয়টও

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের পিছনে যে 'ক্রীড্' আছে তার বিরোধী। কিন্তু তাঁর মতে, এ সাহিত্যের অভাব মঙ্গল বা সৌন্দর্যের অভাব নয়, এ সাহিত্যের আসল ত্রুটি (খ্রীষ্টান) ধর্মনীতির সঙ্গে এর ব্যবধান। কাজেই মোটের উপর, এলিয়টের সাহিত্যিক 'ক্রীড্'কে আমাদের জাগরণ যুগের 'ক্রীডে'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু আজকের বাঙলা সাহিত্যে তেমন কোনো 'ক্রীডে'র অস্তিত্ব নেই, এবং এ অবস্থার জন্য মোহিতলালের দায়িত্ব অনেকখানি। 'বাঙলার জাগরণে'র সাহিত্যের সমাদর করতে গিয়ে তিনি সে যুগের ভাবধারা থেকে বিচ্যুতির পথই পরিষ্কার করেছিলেন।

।। তিন ।।

মোহিতলালের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত মতামত বিশ্লেষণ করলেও এই একই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখানে বলা উচিত মোহিতলাল বাঙলার জাগরণের 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের' প্রতিনিধি ছিলেন ; এক্ষেত্রে 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু' কথাটাকে 'ব্রাহ্মসমাজের' প্রতিপক্ষ অর্থে বুঝতে হবে। আমরা যাকে 'বাঙলার জাগরণ' বলি সেটা এই দুই দলের কীর্তি—নাস্তিকদের স্থান এতে নগণ্য। মোহিতলাল ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুর ধারাটাকেই অনুসরণ করেছিলেন,—এবং প্রমথ চৌধুরী যেমন ব্রাহ্ম ভাবধারার অনুসরণ করতে গিয়ে কার্যতঃ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মোহিতলালও তেমনি ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে তার থেকে অনেকখানি দূরে সরে এসেছিলেন।

ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের সামাজিক মতামত কী ছিল ? 'সমাজ' কথাটাকে ব্যাপক অর্থে নিলে ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে বিশেষ কোনো মতভেদ ছিল না ঃ দুই দলই ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের বিলোপ সমর্থন করেছিলেন এবং ইংরেজশাসিত দেশের নূতনতর সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান পরিবার সম্বন্ধে তাঁদের গুরুতর মতবিরোধ ছিল। ব্রাহ্মরা জোর দিয়েছিলেন বিবাহ-প্রথার সংস্কারে, কিন্তু হিন্দু পরিবারের মূল

ভাবগুলো সম্বন্ধে তাঁরা সচরাচর উদাসীন ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরেজ পরিবার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু যে সমস্ত হিন্দুপরিবারে ভক্তি-প্রীতি-আতিথেয়তার ধারা সজীব ছিল, সেগুলো দেখে তিনি আজকালকার কোনো কোনো লেখকের মতো ভেঙচি কাটতেন কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ বা ঠাকুর-বাড়ি ছাড়া সে-যুগের ব্রাহ্মরা মোটামুটি হিন্দুপরিবারের ভাবধারা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। পক্ষান্তরে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা (বিদ্যাসাগর বাদে) এই মূল ভাবগুলির উন্নতিসাধনেই সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন। বিবাহ-প্রথার সংস্কারে তাঁরা এক-এক জন এক-এক মত পোষণ করতেন। ভূদেব স্পষ্টই সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, বঙ্কিম ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্ত, বিবেকানন্দ কিছু দূর পর্যন্ত সংস্কারপন্থী। কিন্তু মূল ভাবগুলোর উন্নতিসাধনেই তাঁরা বেশি জোর দিয়েছিলেন—ব্রাহ্মরা যেমন বেশী জোর দিয়েছিলেন বিবাহ-প্রথার সংস্কারে।

মোহিতলাল এই ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের পরিবার সংক্রান্ত মতামতের অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের মতে: মা-বাপের প্রতি ভক্তি, স্বামীর প্রতি ভক্তি, আত্মীয় অতিথির প্রতি বাৎসল্য, দাম্পত্য জীবনকে ধর্মজীবনের সোপানে পরিণত করবার অক্লান্ত চেষ্টা—এগুলোই হিন্দুপরিবারের মূল ভাব। মোহিতলাল এগুলোর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের দিকটাই বেছে নিয়েছিলেন, এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে সাহিত্য থেকেই তাঁর পারিবারিক মতামতের প্রমাণ সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যে যে সব জীবন্ত নারীচরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তারা আমাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিশিষ্ট ভাবটুকুর জোরেই জীবন্ত। এ-কথা সত্য হোক, মিথ্যা হোক তিনি এমনও মত প্রকাশ করেছিলেন যে সাহিত্যের এই প্রমাণ জীবনেও গ্রাহ্য এবং হিন্দুসমাজের বিশেষ দাম্পত্য সম্বন্ধটা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষণীয়। বলা বাহুল্য ভূদেবেরও এই মত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দেরও এই মত ছিল—সাধারণভাবে 'বেঙ্গল রেনেসাঁসে'র অধিকাংশ অব্রাহ্ম-প্রতিনিধিরও এই মত ছিল। কিন্তু তাঁরা সচরাচর সামাজিক ভালোমন্দের যুক্তিতেই এরকম মত পোষণ করতেন—সাহিত্য থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করতেন না। কাজেই বলতে হয়, মোহিতলালের মতের শেষ-

ভাগটা বিতর্কসাপেক্ষ, কেননা সমাজের ভালোমন্দে সাহিত্যের সাক্ষ্য প্রামাণিক হতে পারে না, যদিও সাহিত্যের সাক্ষ্য একেবারে উড়িয়ে দিলেও সমাজ-সেবকদের মনের স্থূলতা প্রকাশ পায়।

এমন-কি মোহিতলাল তাঁর মতের সপক্ষে যে-সব সাহিত্যিক 'প্রমাণ' দিয়েছেন তার মধ্যেও দুয়েকটাকে সঠিক বলতে দ্বিধা হয়। ধরা যাক 'শেষ প্রশ্নে'র কমল চরিত্র। মোহিতলালের মতে শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী লেখকও হিন্দু ভাবধারার প্রতি একান্ত-বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন এই মেয়েটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ কথা ঠিক, কমল যদি অত বেশী বক্তৃতা না করে নিজের চরিত্রটাকে কার্যক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলত, তাহ'লে তাকে আরেকটু ভালো লাগত। কিন্তু কমলকে একেবারে ব্যর্থ সৃষ্টি বলে উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না। সে নিরামিষও খায়, আবার পুরুষে পুরুষে বিহার করেও বেড়ায়; হিন্দুর মেয়ের মতো এক ধরনের কঠোর সংযমও সে পালন করে; আবার পুরুষমহলে গিয়ে যখন হিন্দু ভাবধারার বিরুদ্ধে 'ভাষণ' দিতে শুরু করে তখন তার মুখে খৈ ফুটতে থাকে। এ সব জিনিসে অনেক হাসির খোরাক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো লেখক,—ঔপন্যাসিকের প্রত্যেকটি কৌশল যাঁর নখদর্পণে,—তিনি যে এই মানস-কন্যাটিকে এক ধরনের মাধুর্য ও তেজ দিতে পারেননি, একথা চট করে মানতে দ্বিধা হয়।

বরং অভয়া সম্বন্ধে মোহিতলালের মত অনেকখানি গ্রহণযোগ্য। অভয়া শরৎচন্দ্রের ব্যর্থসৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি। দুরাত্মা স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাল্যপ্রণয়ীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সুখে-দুঃখে ঘরকন্না করার কথাটা যত সমবেদনার দৃষ্টিতেই দেখা যাক, শরৎচন্দ্রের কোনো পাঠকই বোধহয় বই বন্ধ করার পর অভয়াকে পাঁচ মিনিটও মনে রাখে না। অভয়ার হয়ে শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র যে ওকালতিটুকু করেছেন, পাঠকের দরবারে সেটা বোধহয় বাজে খরচ হয়েছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে পাঠকের মন কেড়ে নেয় রাজলক্ষ্মী, কমললতা, অন্নদাদিদি। এ তিনজনের একজনকেও হিন্দুসমাজের ভাবধারার বাইরে কল্পনা করা যায় না, কাজেই এক্ষেত্রে মোহিতলালের কথাটা না মেনে উপায় নেই।

কিন্তু মানার পর আরেকটা প্রশ্ন ওঠে, সেটা মোহিতলালের সিদ্ধান্তের ঠিক বিপরীত। হিন্দুর মেয়ের দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং হিন্দুর মেয়ের প্রণয়ের ভিতর এককালে যে ধর্মভাব দেখা যেত, রাজলক্ষ্মীর চরিত্র নিশ্চয় তাইতেই এমন ঐশ্বর্যলাভ করেছে। অর্থাৎ, যে দাম্পত্য সম্পূর্ণ মেকি এবং যে প্রণয় সম্পূর্ণ খাঁটি—এই দুয়ের ধর্মসংঘর্ষজাত টানা-পোড়েনেই তার জীবনের ফুলটি এমন করে ফুটেছে। কাজেই রাজলক্ষ্মীর চরিত্র মোহিতলালের মতের পরিপোষক। আমরা বেশ বুঝতে পারি, প্রাচীন হিন্দুসমাজকে সে মেনে নিয়েছে বলেই রাজলক্ষ্মীর দ্বিধাদ্বন্দ্বমিশ্রিত, ধর্মসঙ্কট-কণ্টকিত চরিত্রে এমন মাধুর্য, এমন শারীরিক—এবং শারীরিকের চেয়ে বেশী মানসিক—কৃচ্ছ্রসাধনের অস্বাভাবিক দীপ্তি। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে অন্নদাদিদির তুলনা করলে মোহিতলালের মত সম্বন্ধে দারুণ সংশয় জাগে। এই সংশয় জাগে যে, অন্নদা যত হিন্দুই হোক—তার হিন্দুত্ব অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়। অন্নদাদিদির সতীত্ব নিয়ে বাঙালী পাঠকসমাজে অনেকদিন যাবৎ যে উচ্ছ্বাস চলে আসছে, কোনো শুভবুদ্ধি দিয়ে বোধ হয় সে জিনিসটাকে সমর্থন করা যায় না। অন্নদার স্বামী তার বিধবা বোনের সন্তান-সম্ভাবনার কারণ হয়ে তাকে খুন করে পালিয়ে গেল, আর অন্নদা তার 'সতী' নামের গৌরব বজায় রাখবার জন্য তাকে অনুসরণ করল এবং মারধোর খেয়েও আজীবন সেই স্বামীর সেবা করে গেল—বাঙলা সাহিত্যে এমন বীভৎস-রসের দৃষ্টান্ত আর নেই। শরৎচন্দ্রের কোনো গল্পই আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না, সম্ভবতঃ এ গল্পের বীজও তিনি বাস্তব জীবনেই পেয়েছিলেন। তা নইলে সাপুড়ে দম্পতির মর্মস্পর্শী কাহিনীর পরিশিষ্ট হিসাবে ঐ পূর্বকথাটুকু জুড়ে দিয়ে গল্পটাকে তিনি এমন উৎকট করে তুলতেন না। কিন্তু বাস্তব ঘটনা দিয়ে উৎকটতার ব্যাখ্যা হলেও শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের দিদি-ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং মোহিতলালের মতো সমালোচক কর্তৃক সে উচ্ছ্বাসের সমর্থন—এ দুটি জিনিসের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। স্বামীভক্তি দামী জিনিস সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্নদাদিদির জীবনে আমরা যা দেখতে পাই সেটা ঠিক স্বামীভক্তি নয়; স্বামীর প্রতি ভক্তির নামে অন্নদাদিদি চরম অধর্মকেও পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছে। আর্টের দিক দিয়েও

এটা আপত্তিকর, কেননা অন্নদাদিদির এই পূর্বকথাটুকু 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অন্নদা-কাহিনীর পক্ষে অনাবশ্যক লেজুড় মাত্র। কিন্তু আর্টের কথা ছেড়ে দিলেও এই পূর্বকথা নিয়ে উচ্ছ্বাস করা না-লেখক, না-সমালোচক, কারো পক্ষেই গৌরবজনক।

এখানেও বলতে হয় মোহিতলাল আমাদের 'জাগরণ' যুগের ভাবধারা থেকে দূরে সরে এসেছেন। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের ভাবধারায় হিন্দুসমাজের দাম্পত্য সম্বন্ধের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সন্দেহ নেই,—কিন্তু অন্নদাদিদির মতো বিকৃত সতীত্বের জয়গান করার কথা সে যুগের কোনো লেখক ভাবতেও পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেখতে পাই, ভ্রমরের স্বামী যে মুহূর্তে পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছে ভ্রমর সেটাকে দারুণ অসম্মানের বিষয় ভেবেছে, এবং স্বামীকে হত্যাকারী জানবামাত্র সে তাকে ত্যাগ করেছে। শান্তি বা প্রফুল্লকেও বঙ্কিম হিন্দু ভাবধারার উদাহরণ-রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু তাদের সতীত্ব এমন বীরহৃদয়ের উচ্ছ্বাস যার সামনে দাঁড়ালে চোখ ঝলসে যায়। একথা ঠিক, শান্তি-প্রফুল্লকে বাস্তব হিন্দুসমাজের পথে-ঘাটে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না, কিন্তু ভ্রমর-লবঙ্গ কিংবা সাগরের মতো মেয়েকে বঙ্কিম প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন—এমন অনুমান অন্যায় নয়। কাজেই বাস্তব হিন্দুসমাজের চিত্রে অন্নদাদিদির পাশাপাশি এদের অস্তিত্বও স্বীকার করা চাই। অন্নদার মতো অসুস্থ সতীধর্ম যে হিন্দুসমাজের লক্ষণ, সেটা হিন্দুসমাজের এক বিকৃত ভগ্নাংশ মাত্র; ১৯শ শতাব্দীর ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা তাকে ত্যাগ করতেই চেয়েছিলেন।

॥ চার ॥

মোহিতলালের এই ভ্রান্তিটুকু একটু স্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করা যাক। বাঙলাসাহিত্যের যে-সব নারীচরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত তারা হিন্দুভাবধারার গুণেই জীবন্ত—এ-কথাটা মোটামুটি সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু এ-কথার অর্থ যদি এই হয় যে, অন্নদাদিদি যে হিন্দু ভাবধারায় মানুষ সেটা আমাদের জীবনেও

অবলম্বনীয়, তাহলে মোহিতলালের কথা অস্বীকার না করে উপায় নেই। অন্নদাদিদি অভয়ার চেয়ে জীবন্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না —আগেই বলেছি সাহিত্যে জীবন্ত-রূপ ধারণ করাই কোনো মতামতের প্রমাণ হতে পারে না। বরং অন্নদাদিদি যে ভাবধারার প্রতীক, সে ভাবধারার সংস্কার চাই ; কেবল ব্রাহ্মরা নয়, বাঙলার জাগরণের 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু'রাও সংস্কার চেয়েছিলেন। এইখানেই মোহিতলাল বাঙলার জাগরণের ভাবধারা থেকে দূরে সরে এসেছেন। এইটেই তাঁর ভ্রান্তি।

একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, মোহিতলালের এই ভ্রান্তির কারণ ঃ তিনি ধর্মের দিকে তত জোর দেননি, 'সমাজধারা' বা প্রথার দিকেই তাঁর মনোযোগ অতিমাত্রায় নিবদ্ধ ছিল। অন্নদাদিদির স্বামিনিষ্ঠা হিন্দু সমাজের একটা প্রথার ধারাবহন মাত্র, তার মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র নেই। অভয়ার স্বামিলঙ্ঘন একটা প্রথার ধারাচ্ছেদন মাত্র,—কিন্তু অভয়ার মধ্যেও কোনো ধর্মভাব নেই। অন্নদা যদি স্বামীসহবাস না করে ধর্মজীবন যাপন করত কিংবা অভয়া যদি স্বামীসহবাস বা দ্বিতীয়বার বিবাহের চেষ্টা না করে ধর্মজীবন যাপন করত—তাহলেই হিন্দুদাম্পত্যের বিশেষ প্রথাটা মর্যাদালাভ করত ঃ কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে এমন মেয়ের দৃষ্টান্ত এককালে সম্পূর্ণ দুর্লভ ছিল না। নিরাশ্রয় এবং অবলা মেয়ের পক্ষে তেমন ধর্ম-জীবন যাপন সচরাচর সম্ভব কিনা অথবা অন্নদা বা অভয়ার ওরকম পরিণতি সার্থক সাহিত্যিক রূপ লাভ করত কিনা সে-সব কথা এখানে তোলবার প্রয়োজন নেই (যদিও ওসব কথার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না)। মোহিতলাল এই ধর্মজীবনের দিকটাই দেখেননি,—এইটেই তাঁর ভ্রান্তি। তাঁর মস্তবড় ত্রুটি এই যে, 'নব্যহিন্দু'দের প্রথানুগামিতার দিকটা, তাঁদের সমাজধারা রক্ষার দিকটা তিনি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রথাকে যে ধর্মের আলো দিয়ে দীপ্ত করে তুলতে হয়, ধর্মহীন প্রথা যে একটা রক্তমাংসবিচ্যুত কঙ্কাল মাত্র, তাঁদের এ বোধটা তিনি স্মরণে রাখেননি। মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ধর্মসংক্রান্ত চিন্তার ব্যাখ্যাকালে তিনি বঙ্কিমের 'হিউম্যানিজ্‌ম্' এবং

বিবেকানন্দের মানবসেবার উপরে খুব বেশী জোর দিয়েছিলেন। এ দুটোর পিছনে যে আস্তিক্যবুদ্ধির প্রবল প্রেরণা বিদ্যমান ছিল,—গীতা-উপনিষদের ভাবধারার প্রতি যে আন্তরিক স্বীকৃতি ছিল—সে দিকটাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন বললেও ভুল হয় না। দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্কিমের নায়িকাদের বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করেননি। "আমার অপেক্ষা আমার পতি বড়। তাঁর অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়"—বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার এ উক্তি যে হিন্দুদাম্পত্যের মর্মকথা হতে পারে এ জিনিসটা তিনি লক্ষ্যই করেননি। অন্নদাদিদির কাছে 'ধর্মের' অপেক্ষা পতি বড় —এ অবস্থার শোচনীয়তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। কাজেই সমাজসংক্রান্ত মতের দিক দিয়ে মোহিতলালের লেখায় বাঙলার জাগরণের অবসানের লক্ষণ প্রকট।

॥ পাঁচ ॥

প্রমথ চৌধুরী ও মোহিতলাল মজুমদার দুজনেই বাঙলার জাগরণের সন্তান এবং ঐ জাগরণের প্রতি দুজনেরই শ্রদ্ধা আন্তরিক। মোহিতলালের শ্রদ্ধা কেবল আন্তরিক নয়, গভীরতার দিক দিয়েও অপরিমিত। অবশ্য তাঁদের দুজনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল: প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িকতা এবং মোহিতলালের ক্ষেত্রে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা। এতে দোষ ধরা যায় না, কারণ বাঙলার জাগরণও ব্রাহ্মসমাজ আর ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু—এই দুই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অধ্যবসায়ের ফল। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর জাগরণের প্রতি শ্রদ্ধার আন্তরিকতা সত্ত্বেও দুজনেই, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, জাগরণের যুগ থেকে সরে আসছিলেন। তার কারণ, নীতিধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য এবং নীতিধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক মতামত ১৯শ শতাব্দীর ভাব নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে: ১৯শ শতাব্দীর প্রতি মোহিতলাল ও প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রদ্ধার আন্তরিকতা, এবং শ্রদ্ধার আন্তরিকতা সত্ত্বেও ১৯শ শতাব্দীর ভাবধারা থেকে এই বিচ্যুতি—এর কারণ কী? একটু ভেবে দেখলে মনে হয়, এটা অস্বাভাবিক নয়। মোহিতলালের যৌবন ও

প্রমথ চৌধুরীর প্রৌঢ়কালের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মান্দোলন রাজনৈতিক বিপ্লবের চোরাবালিতে অন্তর্ধান করে—ধর্মজাগরণের বিদ্যাচর্চা জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বিকৃত হয়, ব্রাহ্মসমাজ আত্মকলহে গতাসুপ্রায় হয়; সবচেয়ে বড় কথা, মেকলে-প্রবর্তিত একান্ত ধর্মহীন শিক্ষার ফল একটু একটু করে পাকতে শুরু করে। মোহিতলাল এই সবকয়টি সমসাময়িক প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং সেইজন্যই বাঙলার জাগরণের ভাবধারা থেকে আস্তে আস্তে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধেও একথা অল্পবিস্তর সত্য। আজ আমরা জানি, ১৯শ শতাব্দীর 'জাগরণের' আলোয় যাঁরা মশাল ধরেছিলেন তাঁদের কেউ বা ছিলেন ব্রাহ্ম কেউ বা ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু; ১৯৪৭ সালের পরবর্তী অন্ধকারে যাঁরা আলো দেবার ব্রত নিয়েছেন, তাঁদের কেউ বা 'সেকিউলারিস্ট' প্রগতিবাদী, কেউ বা মার্ক্সের শিষ্য। মোহিতলাল-প্রমথচৌধুরী এই দুই যুগের সীমান্তরেখার অধিবাসী। সেকিউলারিস্ট প্রগতিবাদীদের মূলকথা হচ্ছে: বর্তমান যুগে 'হিন্দু সভ্যতা' বলে কিছু থাকতে পারে না, 'আগাপাস্তলা' ইউরোপের অনুকরণ করাই 'আধুনিক সভ্যতা'। মার্ক্সশিষ্যদের মূলকথা হচ্ছে: হিন্দুসমাজ ধর্মমূলক—কাজেই সামন্ততান্ত্রিক, অর্থাৎ এ-যুগের পক্ষে অচল। তাঁদের মতে, আসল সভ্যতা আছে রাশিয়া আর চীনে, তবে ইউরোপের 'বুর্জোয়া' সভ্যতাও হিন্দু সভ্যতার চেয়ে লক্ষ গুণে 'আধুনিক'—অর্থাৎ ভালো। মোহিতলাল-প্রমথ চৌধুরী কেউই এসব বিশ্বাস পোষণ করতেন না, কাজেই তাঁদের কাউকেই পূর্বোক্ত দুই দলে স্থান দেওয়া যায় না। কিন্তু ধর্মহীন সাহিত্যিক ক্রীড্ এবং ধর্মবিমুখ সামাজিক ভাবধারার উপর জোর দিয়ে তাঁরা বাঙলার 'জাগরণে'র ভিত্তিভূমিকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন।

॥ ছয় ॥

তবু মোহিতলাল সম্বন্ধে কিছু গৌরবের কথা আছে। প্রমথ চৌধুরীর কথা সন্দেহস্থল হলেও মোহিতলাল সম্বন্ধে আমরা জানি: তিনি (১) সেকিউলারিস্ট প্রগতিবাদী ও (২) মার্ক্সীয় প্রগতিবাদী,—আধুনিক ইংরেজিনবীশদের এই দুই দলের

মধ্যে একটিতেও যোগ দেননি, বরং দুই দলের প্রতিই যথেষ্ট ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে বাঙলার জাগরণের ভাবধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অনেক বেশি গভীর ছিল—সেই ভাবমণ্ডল থেকে সজ্ঞানে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁর ধর্মহীন সাহিত্যিক 'ক্রীড্' এবং ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজধারার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া—এগুলোতে বাঙলার জাগরণের যথাযথ অনুসরণের পথ ছিল না; অথবা ততটুকুই ছিল যতটুকু সে যুগের মনীষীদের সমাজধারা-রক্ষা-প্রচেষ্টার অনুরূপ। এইজন্য দেখা যায়, মোহিতলাল শেষ বয়সে 'জাতীয়-জীবন-সঙ্কট' নিয়ে যেটুকু চিন্তা করেছিলেন—তার মধ্যে ভুলভ্রান্তির ভাগই বেশি। যুক্তিতর্ক যেটুকু করেছিলেন সেটা মহাত্মা গান্ধী ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের বিরুদ্ধে—এও কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে বাঙলা ও যে বাঙালীর অধঃপতনের কথা ভেবে তিনি এত কাতর হয়েছিলেন তাদের মনের গতিটাই তিনি বোঝেননি। তিনি বোঝেননি: মহাত্মার 'মতবাদের' কথা দূরে থাক, 'মানুষ' মহাত্মা সম্বন্ধেও বাঙালীর মধ্যে কখনোই বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর অবনতি 'গান্ধীবাদ' থেকে হয়নি—যে কারণে হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যেই ছিল তার বীজ। একটু আগেই আভাস দিয়েছি, স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালীর রাজনীতি ধর্মের দ্বারা 'নিয়ন্ত্রিত' না হয়ে ধর্মকে 'অতিক্রম' করেছিল: (১) ধর্মকে গুপ্তহত্যা ও চক্রান্তের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলায় ১৯শ শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তদুপরি স্বদেশী যুগ থেকেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধ প্রকট হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল। (২) তখন থেকে ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার ফলে বাঙালীর সাহিত্য ১৯শ শতাব্দীর 'জাগরণের' 'ক্রীড্'কে পরিত্যাগ করেছিল। শুধু তাই নয়,—(৩) ১৯শ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ যে সামাজিক মতকে স্বীকার করে নিয়েছিল—"সমাজের ধারা রক্ষা করেই সমাজের সংস্কার করতে হবে"—সেই মতটাও তখন থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। মোহিতলাল, বাঙালীর জাতীয়

জীবনে এ তিনটি পরিবর্তনের একটিকেও স্পষ্ট করে বোঝেননি (কেবল শেষেরটা কতক বুঝেছিলেন) ; এবং এই বোধের অস্পষ্টতাই তাঁকে কখনো অশ্লীল সাহিত্য, কখনো গান্ধীবাদ, কখনো বা রবীন্দ্রনাথের মতামত—এই রকম নানা অসংলগ্ন ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে শরসন্ধানের অব্যবস্থিতচিত্ততায় নিযুক্ত করে তাঁর সৎ চেষ্টাকে আবিল করে তোলে। এইজন্য তাঁর গৌরবের কথা বলতে গেলে প্রথমে তাঁর ন্যূনতার কথা আরেকটু বলতে হয়—কেননা তাঁর ন্যূনতা কেবল মতামতের ন্যূনতা নয়, কিয়ৎপরিমাণে চারিত্রিক ন্যূনতাও বটে। তাছাড়া, গান্ধীবিদ্বেষই সে ন্যূনতার একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়।

এ প্রবন্ধ মোহিতলালের জীবনচিত্র নয়। কাজেই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এটুকু বললেই চলবে যে, অনেকদূর পর্যন্ত এই ন্যূনতার কারণেই তাঁর শেষ জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের পরে গদ্য ও পদ্য উভয় দিকে তাঁর মতো শক্তিশালী লেখক বাঙলা দেশে খুব বেশী সংখ্যায় জন্মাননি—অথচ শেষ বয়সে তাঁরই মতো লেখককে সাহিত্যিক সমাজ থেকে নির্বাসিত, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত এবং নানা বাজে লোকের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়। এর পিছনে যে সব মত, ব্যক্তি বা দলের প্ররোচনা কাজ করেছিল, সেই অপ্রীতিকর আলোচনায় কালক্ষেপ না করে আমি কেবল মোহিতলালের নিজের দায়িত্বটুকুই উল্লেখ করব। —চোখের সামনে দেশজোড়া অবনতির লক্ষণ প্রকট দেখে তিনি জ্ঞানহারা হয়ে যাকে তাকে আক্রমণ করে বসেছিলেন। ফলে পরাস্তও হয়েছিলেন সর্বতোভাবে।

মহাত্মাকে বাদ দিলে আর যাঁরা মোহিতলালের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানেও একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাই। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে বাঙলা দেশে যে অধঃপতনের ঢল নামে তার দ্বারা দুটো অঞ্চল প্রথমেই জলপ্লাবিত হয়। এক, সাহিত্য : সাহিত্যক্ষেত্রে তখন থেকে অশ্লীলতার একটা তাণ্ডব শুরু হয়। দ্বিতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ধারা : 'ইঙ্গ-বঙ্গ' নামে যে দো-আঁশলা সমাজ ইতিপূর্বে

আই-সি-এস্, বার-এ্যাট্-ল, প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি উপজীবিকা আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, ঐ সময় থেকে সেটা উকিল, ডাক্তার, কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যিক প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীভুক্ত লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এটুকু ছিল মোহিতলালের যৌবনকালের 'প্রগতিবাদ'।—এখন যেমন এই প্রগতিবাদ 'সেকিউলারিস্ট' ও 'মার্ক্সীয়' এই দুটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামায় বিভক্ত হয়েছে, তখনও তা হয়নি, যদিও মোহিতলালের শেষ জীবনেই এই শিরোনামাগত ভাগ-বিভাগের কাজটা শুরু হয়। মোহিতলাল অবিভক্ত 'প্রগতিবাদ'কেই আক্রমণ করেছিলেন অথচ তার জন্য দায়ী করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। এর পিছনে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উত্তেজনা ছিল সেটা ১৯শ শতাব্দীর হিন্দু-ব্রাহ্মের দলাদলি। মোহিতলাল ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরূপেই দলাদলি করেছিলেন অথচ রবীন্দ্রনাথের নামে দোষ চাপিয়ে-ছিলেন প্রগতিবাদের। অবশ্য এ অপবাদ মিথ্যা—রবীন্দ্রনাথ বাঙলার জাগরণের ব্রাহ্ম ধারারই শেষ ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, প্রগতিবাদের সঙ্গে তাঁর লেশমাত্র সম্পর্ক ছিল না। তাঁর শেষ বয়সে কিছু কিছু লেখায় স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়. হিন্দু-ব্রাহ্ম যুগের বাঙালীদের চেয়ে প্রগতিযুগের বাঙালীদের তিনি অনেক নিম্নস্তরের জীব ভাবতেন। মোহিতলালের হাতে যুক্তি ছিল এটুকু মাত্র যে, প্রগতির দল রবীন্দ্রনাথের নামে শপথ করেই তাদের দো-আঁশলা ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের সপক্ষে-বিপক্ষে কিছুই লেখেননি বা বলেননি। এমন কি তাঁরই সৃষ্ট যে শব্দ, সেই 'প্রগতি' কথাটার অপব্যবহারেও প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু মোহিতলাল বোঝেননি রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতায় কোনো কিছুই প্রমাণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে সমকালীন বাঙালীর "সাহিত্যিক মুরগীর লড়াই"য়ে যোগ দেবেন একথা ভাবাই তাঁর অন্যায় হয়েছিল। বড় মানুষের নামের আশ্রয়ে অনেক ছোট মানুষও বড় হতে চায়—বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তার জন্যে যিনি আমাদের দেশের মুখ অতখানি উজ্জ্বল করেছেন, যাঁর ভাষার স্নিগ্ধতা ও চরিত্রের মাধুর্য আমাদের অভাগা দেশের এত বড় সম্পদ, তাঁকে তাঁর অন্তিম জীবনে

এমন করে আক্রমণ করা অন্যায়। এ কথা বলব না যে, রবীন্দ্রনাথের মতামতের সমালোচনায় কোনো হানি আছে, কিন্তু মোহিতলালের আক্রমণ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ-কেও রেহাই দেয়নি। এ আক্রমণও তাঁর ন্যূনতার দিক এবং এটা তাঁর চরিত্রের ন্যূনতা। তাঁর মতবাদের যে ন্যূনতার কথা আগে বলেছি তার সঙ্গে এটুকুও যোগ করতে হবে।

কথা উঠবে, যদি তাই হয়, তাহলে মোহিতলালের গৌরব কী? গৌরব এই যে, গত ত্রিশ-চল্লিশ বছর যাবৎ দেশ জুড়ে মনুষ্যত্বের যে নব-নব আদর্শ খাড়া করে জয়ঢাক বাজানো হচ্ছে, সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে একা মোহিতলালই সে ঢাকে কাঠি দেননি, নীতিধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যিক জ্ঞানযোগের প্রবক্তা হয়েও নীতিধর্ম-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের ধারণাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। সম্ভবতঃ এটা তাঁর মতামতের একটা স্ববিরোধেরই ফল, কিন্তু এই স্ববিরোধের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে গৌরবের দিকটা জাজ্জ্বল্যমান। আমাদের জাতীয় জীবনসঙ্কট থেকে পরিত্রাণ আমরা কিসে পাব, কংগ্রেসী আইডিওলজির দ্বারা পাব, কি বিপ্লবের পথে পাব, কি তৃতীয় কোনো উপায়ে পাব, সে আমরা জানি না। মোহিতলালও নিশ্চয় এ ব্যাপারে ভুল করেছিলেন। কিন্তু জাতীয়-জীবন-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে না পারলেও, মনীষী ব্যক্তিদের যে আরেকটা বড় দায়িত্ব থাকে—দেশের সর্বত্র মনুষ্যত্বের আদর্শ জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব—তিনি সে দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করেছিলেন। আমাদের উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু আগে থেকেই মনুষ্যত্বের যে নব-নব আদর্শ ঘোষণার অভ্যাস দেখা দিয়েছিল, মোহিতলাল সে অভ্যাসকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এখন তো দেখতে পাই: দেশের পথেঘাটে নানাবিধ 'জীবনাদর্শের বান ডেকে যাচ্ছে। কেউ বলছেন: কাব্যকলার চর্চা করেই আমরা জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করব। কেউ বলছেন: ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির চর্চা করেই আমরা মহান হব। কেউ বলছেন: কামের হাত ধরেই আমরা পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হব। কেউ বলছেন: হিন্দুধর্মটাকে নিমতলার ঘাটে চালান করে দিলেই আমরা শ্রেয়ের পথ দেখতে পাব। একা

মোহিতলাল এই দেশজোড়া ডামাডোলে যোগ দেননি।—সংস্কৃতি, কামতন্ত্র, সায়ান্টিফিক হিউম্যানিজ্‌ম, হিপিবাদ প্রভৃতি ছেঁদো 'জীবনাদর্শের' নামে মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করতে তাঁর সমূহ আপত্তি ছিল। তাঁর এই সংযম যে কত বড় জিনিস, তার একটিমাত্র প্রমাণ দিলেই চলবে। সাহিত্যসাধনাকে তিনি নিজের অধ্যাত্ম সাধনার উপায় মনে করতেন—সাহিত্য ছাড়া আর কোনো জিনিসেই তাঁর আসক্তি ছিল না। অথচ শেষ জীবনে তিনি সাহিত্যচর্চাকেও গৌণ করে দেশ ও সমাজের দুর্গতির ভাবনায় একান্তরূপে ব্যথিত হয়ে দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি দল, প্রতিটি প্রভাবশালী মতামতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর নিজের মতামত যথার্থ ছিল, একথা বলছি না ; তাঁর আক্রমণের উগ্রতাও সবসময় ন্যায়ধর্মের অনুমোদিত ছিল, একথাও বলছি না ; রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের নিন্দাও আমরা করেছি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের আরামদায়ক কল্পনায় বিমূঢ়প্রায়, এবং 'আমরা এখন রকেটের গতিতে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছি' —এই অলীক ভাবনায় মাতোয়ারাপ্রায় প্রতিটি 'বুদ্ধিজীবী'র সুখস্বপ্নকে তিনি একা সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তিনি প্রাচীন 'জীবনাদর্শের' সুযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু 'জীবনাদর্শ' জিনিসটাকে তিনি ছেলের হাতের মোয়া ভাবতেন না। লক্ষলোকের করতালি শব্দের মধ্যে তিনি তাঁর একার হাত দুটো শক্ত মুঠোয় বেঁধে রেখেছিলেন। 'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন' বা রঙ্গমঞ্চের নৃত্যগীত অথবা কামক্রীড়ার নানা কৌশলে পরিপূর্ণ সাহিত্য ও সিনেমা যে-সমাজের উচ্চতর জীবনের উপায় বলে স্বীকৃত, সেখানে তিনি সাধনা করেছিলেন মানসিক কঠোরতা ও তপস্যার, দেশজোড়া ডামাডোলের মধ্যে তিনি সাধনা করেছিলেন গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন মত-স্বাতন্ত্র্যের—এইটেই মোহিতলালের গৌরব।

আর তাঁর দ্বিতীয় গৌরব এই যে, তাঁর ন্যূনতার দিকগুলিও একজন তেজী লোকের ন্যূনতা। এগুলোতে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হয়নি, বরং এসবের দ্বারা তিনি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছিলেন। অনেকে লোক নিন্দার বেসাতি করেই বড়লোক হয়—আধুনিক কালে এই বাঙলা দেশেই তার অনেক

দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। মোহিতলাল এই নিন্দা-ব্যবসায়ীদের দলভুক্ত ছিলেন না বরং অপ্রিয়ভাষিতার দ্বারা তিনি নিজের জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন, তাইতেই -এ মনে হয়, তিনি এ-যুগের বাঙলার অত্যল্পসংখ্যক নমস্য ব্যক্তিদের একজন। তিনি নিজে দাবি করেছিলেন: সত্যকে তিনি যেমন বুঝেছেন তারই জন্যে এবারের জীবনটা 'হরির লুট' দিয়ে গেছেন। এ দাবি দাম্ভিকতায় পরিপূর্ণ হতে পারে, তাঁর সত্যবোধের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁর এই কথাটা একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। এ প্রবন্ধে তাঁর ন্যূনতার কথাই পাঁচ কাহন করে বলা হয়েছে, কিন্তু বিচারের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য প্রবন্ধশেষে স্বীকার করা চাই, মোহিতলালকে যে নমস্য ব্যক্তি বলা হয়েছে, সে কথা এক বিন্দুও অতি-রঞ্জিত নয়। তিনি প্রতিভাশালী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিভার জোরে কেউ নমস্য হয় না। মোহিতলাল সম্বন্ধে এই বিশেষণ ব্যবহার করার আরো যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। আর কিছু না হোক, তিনি শুধু এই কারণে আমাদের নমস্য যে, 'জাগরণ যুগের' কেন্দ্রচ্যুত হয়েও 'অবনতির যুগ'কে তিনি সজোরে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন; স্বাধীনতার পরে 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো' কতকগুলি অযোগ্য লোকের হাতে যে ক্ষমতা এসেছিল সেই ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতা-লোলুপ এবং সংস্কৃতি-বিলাসী সাহিত্যিকের সমাজ থেকে নিজেকে ঘৃণাভরে দূরে রাখতে পেরেছিলেন; তার জন্যে অকুতোভয়ে বরণ করতে পেরে-ছিলেন অনাদর, অসম্মান, বুড়ো বয়সের কঠোর দারিদ্র্য এবং জীবিকানির্বাহের অমানুষিক পরিশ্রমজনিত অকালমৃত্যু। আমাদের দেশের মাটিতে এসব জিনিস এমন ছাপাছাপি যায় না যে, মোহিতলালের এই গুণগুলিকে আমরা অবজ্ঞা করতে পারি। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তাঁর ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মেরুদণ্ড নিয়েই মোহিতলাল জন্মেছিলেন—সে মেরুদণ্ড বজ্রের মতো কঠোর, শালগাছের চেয়ে ঋজু। এইজন্যই মোহিতলাল আমাদের নমস্য—তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট উগ্রতার জন্য নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কু-ভাষা ব্যবহারের জন্য নয়, তাঁর নিজের কোনো মতবাদের জন্যও নয়।

নীরদ চৌধুরী

।। এক ।।

নীরদ চৌধুরীই বোধ হয় একমাত্র লেখক, যিনি সাম্প্রতিক ভারতের মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার অবনতি সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে ভেবেছেন। তাঁর লেখা অজস্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাঁর মতামতের উপর দিয়ে নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। অন্যেরা দেশের দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে লেখালেখি করেছেন, অনেকে সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্কট সম্বন্ধে লিখেছেন, কিন্তু নীরদ চৌধুরী বিশেষ করে মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার দিকটাতেই জোর দিয়েছেন। 'জোর দিয়েছেন' বললেও কম বলা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই তিনি, গোটা দেশের প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে, অত্যন্ত কটু ভাষায়, এবং প্রাচীন হিব্রু পয়গম্বরদের মতো তীব্রতা সহযোগে, আমাদের নৈতিক ও আত্মিক অবনতির কথা বারেবারেই মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেশের লোক তাঁর কথায় কান দেয় নি ;—কান দেওয়া দূরে থাক, যে কোনো মনস্বী ব্যক্তি তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে যেটুকু ভদ্রতা ও সম্মান প্রত্যাশা করতে পারেন, সেটুকুও তাঁকে দেয়নি, বরঞ্চ কটু কথার জন্যে তারা তাঁকে দেশ থেকে প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসন স্বীকারে বাধ্য করেছে। আমার কাছেও নীরদবাবুর সব মত সমান দামী বলে বোধ হয় না, কিন্তু সে-সব মতের সমালোচনা করার আগে, তাঁর প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আমি উচিত মনে করি। তা নইলে নিজের কাছেই এইরকম একটা জবাবদিহির প্রশ্ন ওঠে : অনর্থক নিন্দুকের দল ভারী করে লাভ কী ?

।। দুই ।।

কী তাঁর মতামত ?—নীরদ চৌধুরীই বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি আমাদের দেশের (বিশেষ করে পশ্চিম বাঙলার) বর্তমান অবনতিকে ১২৭

শতাব্দীর ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের ধর্মবিষয়ক আন্দোলনের পতনের সঙ্গে যোগ করে কতকগুলো খাঁটি কথা বলেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন, আমাদের আজকের অবনতি একদিনের ব্যাপার নয়,—১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় যে উন্নতির জোয়ার এসেছিল, আজকের অবনতি তারই অকালমৃত্যুর অনিবার্য পরিণাম। ইতিহাসজ্ঞ লেখকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই স্পষ্ট করে লিখেছেন: সে-যুগের মানসিক ও নৈতিক জাগরণের মূলে ছিল দুটো ধর্মবিষয়ক আন্দোলন—ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের ধর্মান্দোলন। তিনিই অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন, কেবল ইংরেজিশিক্ষা নয়—সংস্কৃতচর্চার দ্বারাও আমাদের ১৯শ শতাব্দীর সভ্যতা পুষ্টিলাভ করেছিল।* তাঁর লেখাতেই আমরা প্রথম টের পাই: রাজনীতির চাপে সে-যুগের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক ধ্যানধারণা যখন থেকে দেশের লোকের কাছে গৌণ হয়ে পড়ল, তখন থেকেই আমাদের অবনতির শুরু। বিশেষ করে এই শেষ কথাটির দ্বারাই নীরদবাবুর চিন্তার মৌলিকতা বোঝা যায়;—আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে (মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার ক্ষেত্রে) আমাদের অবনতির এই সম্পর্কটুকু আর কোনো লেখক এত স্পষ্ট করে বলতে সাহস করেননি।

॥ তিন ॥

তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন:

[গান্ধীযুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা নূতন জিনিস দেখা গেল]:— রাজনীতি ছাড়া মানুষের আর যা কিছু ক্রিয়াকলাপ, সবই রাজনীতির চাপে গৌণ হয়ে পড়ল। এর মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তার গভীরতা এক কথায় অপরিসীম, তার কারণ রাজনীতির এমন একচ্ছত্র প্রভুত্ব এর আগে কখনও আমার চোখে পড়েনি। এমন নয় যে এর আগেও আমরা রাজনীতি নিয়ে প্রয়োজনের

* তাঁর আত্মজীবনীর Torch Race of the Indian Renaissance এবং Vanishing Landmarks শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চেয়ে অনেক বেশি মাতামাতি করিনি; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে রাজনীতি ছিল অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়। সেগুলির মধ্যেও হয়তো তার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য ছিল, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর মন থেকে ধর্ম ও নীতিসংক্রান্ত আগ্রহকে এবং সাহিত্যপ্রেমকে সে কখনও দূর করে দিতে পারেনি।
—(The Autobiography of an Unknown Indian ; Jaico, Page 451)

নীরদবাবুর এই বিবরণ ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যবর্তী কাল সম্পর্কে। তাঁর মতে ঐ সময় থেকেই আমাদের দেশে একটা অবনতির যুগ শুরু হল, স্বাধীনতার পরের ইতিহাস সেই অবনতির ক্রমিক মাত্রাবৃদ্ধির ইতিহাস মাত্র। তিনি বলেন, ঐ রাজনৈতিক নেশাগ্রস্ত জাতীয় মনের যে হাড়িকাঠ, তার প্রথম বলি হল আমাদের ১৯শ শতাব্দীর নীতিজ্ঞান—যে নীতিজ্ঞান ব্রাহ্ম আন্দোলন ও বঙ্কিম-বিবেকানন্দের নব্যহিন্দু আন্দোলনের ফল। তখন থেকে দেশময় নৈতিকতার যে অবনতি দেখা দিল তার সঙ্গে আগেকার অবস্থার তুলনা করে নীরদবাবু বলেন:

"[ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দু আন্দোলনের] নীতিজ্ঞান আমাদের সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল আমি তার দুয়েকটা উদাহরণ দেব। টাকা রোজগার বা জীবিকা-নির্বাহের কতকগুলি বিশেষ উপায়ের উপর ঐ নীতিজ্ঞানের কড়া শাসন আমার স্বচক্ষে দেখা। অজস্র লোককে আমি জানতাম যারা শুধু কেবল নৈতিক কারণে ওকালতি বা অন্য কোনো ব্যবসা করতে চাইত না, তার কারণ ওসব কাজে একটু আধটু অসদুপায়ের ছায়া না মাড়িয়ে চলা যায় না। অনেককে জানতাম যারা দেশের প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে সরকারি চাকরি করতে চাইত না। অনেকে সন্তান বা আত্মীয়স্বজনের চাকরির জন্য দায়ে পড়েও তাদের উর্ধ্বতন অফিসারদের ধরাধরি করত না। আমি অনেক উচ্চপদস্থ বাঙালী অফিসারকে নিজের কানে বলতে শুনেছি, 'আমার ছেলেরা যেন কোন সময়ই না ভাবে যে আমি আমার নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে তাদের চাকরি জুটিয়ে দেব'। দুর্নীতি সবস্তরেই ছিল, কিন্তু সমাজে ঘুষখোর বা ঘুষের টাকার

সম্মান ছিল না। একবার একটি লোক আমার বাবার কাছে তার জামাইয়ের উপরি রোজগার নিয়ে বড়াই করছিল। বাবা কী প্রচণ্ড ঘৃণার ভাবে লোকটার কথা বলেছিলেন সে আমার নিজের কানে শোনা। আজ যখন সেদিনকার কথা ভাবি, যখন ভাবি, লোকে একদিন নিজের ধ্যানধারণার খাতিরে হাতে-পাওয়া চাকরি ফিরিয়ে দিত, চাকরি করতে গিয়ে গবরমেণ্টকেও প্রতারণা করত না, নিজের ধ্যানধারণাকেও জলাঞ্জলি দিত না, ফাঁকিবাজি বা স্বজনপোষণে লজ্জা পেত, অসৎপথের রোজগারকে ঘৃণা করত—তখন আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়।" (ঐ ৪৫২ পৃষ্ঠা)

॥ চার ॥

কিন্তু নীরদ চৌধুরী যদি কেবল ঘুষখুরি প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির কথা নিয়েই লেখালেখি করতেন, তাহলে তাঁর লেখার এত গুরুত্ব থাকত না। এ-রকম লেখালেখি আজকাল অনেক লেখকই করে থাকেন, এবং প্রত্যেকেই এই সমস্ত পাপের প্রতিকারের জন্য গবরমেণ্টকে শক্ত হতে উপদেশ দেন। নীরদ চৌধুরী গবরমেণ্টের হাতে সামাজিক উন্নতি-অবনতির সবটুকু দায়িত্ব চাপাননি, —কিন্তু এইটেই তাঁর একমাত্র বিশেষত্ব নয়। এই নৈতিক পাপগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি আরেকটু গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধীযুগের একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন :

"১৯২৯ সালের কাছাকাছি একটা ঘটনা দেখে দেশের হাওয়াবদল সম্বন্ধে আমার মনে একটা বড় রকম উপলব্ধি হল। আমার দাদার পরিচিত এক মহিলা একদিন দাদার সঙ্গে কথা বলছিলেন—ঘটনাচক্রে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্ত্রীলোকটি যুবতী—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করা। দাদা একজন ভদ্রলোকের কথা বলছিলেন—আপিসের তহবিল থেকে বেশ কয়েক লাখ টাকা সরানোর দরুন এঁর জেল হয়েছিল এবং এখনও ইনি কয়েক বছরের জন্য সশ্রম জেলবাসের সাজা ভোগ করছিলেন। দাদার কথা শুনে মহিলা খুব শান্তভাবে

এবং বাহবার ভঙ্গিতে জবাব দিলেনঃ 'পুলিশ কিন্তু টাকার হদিস পায়নি, টাকাটা ওর কাছেই মজুত আছে'।—এই উত্তর শুনে স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ আমার মনে যে একটা আত্মগ্লানির ভাব জমা হয়ে ছিল, সেটা এক মুহূর্তেই মুছে গেল। এঁর মুখেচোখে এমন একটা হীনতার ছাপ ছিল যে, এঁর সঙ্গে সাধারণ ভদ্র ব্যবহার করতেও আমি এতদিন ভিতরে ভিতরে বাধা পেয়ে আসছিলাম—তা নিয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ বিবেক-দংশনও ছিল। কিন্তু এ-ঘটনার পর থেকে আমি সেই বিবেক-দংশনের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। আমি স্পষ্টই বুঝলাম এই তরুণী যুবতীর মুখের হীনতা তার আত্মিক হীনতারই প্রতিবিম্ব মাত্র"। (ঐ পৃঃ ৪৫৩)

॥ পাঁচ ॥

যাঁরা এই 'আত্মিক হীনতার' সূত্রটা মনে না রাখবেন, তাঁদের কাছে নীরদ চৌধুরীর লেখার গুরুত্ব কখনোই স্পষ্ট হবে না। আরো এমন লেখক আছেন যাঁরা আমাদের দেশের আধুনিক অবনতির কথা স্বীকার করেন, কিন্তু এই অবনতিকে তাঁরা সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তক্‌মা-আঁটা শাস্ত্রবচনের আড়ম্বর ছাড়া বুঝতে চান না। এঁরা ভুলে যান, আজ পর্যন্ত এমন কোনো বিজ্ঞান বেরোয়নি যার দ্বারা দেশের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে পাকাপাকি জ্ঞান হয়। চেষ্টাচরিত্র করে ঘুষের স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ নেওয়া যায়, কিন্তু দেশজোড়া 'আত্মিক হীনতা'র স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ নেবে কে? নীরদবাবুর 'আত্মজীবনী' এবং 'দি কন্টিনেন্ট অব সার্সি' প্রভৃতি বইয়ের আসল গুরুত্ব এই যে, তিনি কোনো বৈজ্ঞানিকতার আড়ম্বর না করে অজস্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তাঁর প্রখর বুদ্ধির আলো ফেলেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল বলেই দেশের দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁর অনুভব এত মর্মস্পর্শী হয়েছে। যে-সব সমালোচক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক "কর্মসূচী" নিয়েই দিবারাত্র মাতামাতি করেন, এবং তিনি তেমন মাতামাতিতে যোগ দেননি বলে যাঁরা গরম হয়ে ওঠেন, তাঁরা

নীরদবাবু বর্ণিত দেশজোড়া 'আত্মিক হীনতা' সম্বন্ধে অতিশোচনীয় অজ্ঞতারই পরিচয় দেন—তাঁদের নিন্দা তাঁর লেখাকে স্পর্শও করতে পারে না।

॥ ছয় ॥

সে যাই হোক, এইটুকু হচ্ছে নীরদ চৌধুরীর 'ডায়েগনসিস' ; —আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত দেশ সম্বন্ধে তাঁর এই নির্ণয়কে 'ধর্মবুদ্ধির বিপর্যয়' নাম দিলে অন্যায় হয় না। এই নির্ণয় সম্বন্ধে কোনো আপত্তি উঠতে পারে না, বরং ধর্মবুদ্ধির এই বিপর্যয়ের দিকে বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি ভারতবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন। কিন্তু যখন আমরা তাঁর 'ডায়েগনসিস' থেকে তাঁর চিকিৎসা-প্রণালীর দিকে এগিয়ে যাই, তখন হঠাৎ অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে দেখতে পাই, তাঁর 'ডায়েগনসিসের' সঙ্গে তাঁর 'প্রেসক্রিপশনের' বিশেষ কোনো মিল নেই। তার কারণ তিনি স্পষ্টই বলেন : প্রথমতঃ আমাদের হিন্দু পরিচয়টা ভুলে যেতে হবে, দ্বিতীয়তঃ আমাদের 'খাঁটি ইউরোপীয়' হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। ('খাঁটি ইউরোপীয়' কথাটা তিনি ব্যবহার করেননি, কিন্তু 'দি কন্টিনেণ্ট অব সার্সি' বইটিতে হিন্দুদের তিনি আত্মবিস্মৃত ইউরোপীয় বলে মতপ্রকাশ করেছেন,—এমন ইউরোপীয় যারা ভারতের কর্মশক্তিনাশা জলবায়ুর চাপে তাদের আসল পরিচয়টা ভুলে গেছে। কাজেই 'খাঁটি ইউরোপীয় হওয়া' বা 'খাঁটি সাহেবিআনার চর্চা করা'কেই নীরদ বাবুর 'প্রেসক্রিপশন বললে ভুল হয় না') ।—এ চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, এটা তাঁর 'ডায়েগনসিস' থেকে আসেনি ;—অন্ততঃপক্ষে, আমাদের ধর্মবুদ্ধির ফাটলগুলো যে 'খাঁটি ইউরোপীয়' হবার চেষ্টা করলেই মেরামত হয়ে যাবে এ জিনিসটা চট করে বোঝা যায় না। কাজেই এমন সন্দেহ করা অন্যায় নয় : যে ডাক্তার তার রুগীর শরীরে কলেরা-রোগের প্রত্যেকটি লক্ষণ যাচাই করে দেখার পর বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বাড়ি চলে যায়, তার ডাক্তারির সঙ্গে নীরদবাবুর ডাক্তারি এক।

কিন্তু এইটেই তাঁর ডাক্তারির বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি নয়। আরেকটা আপত্তি

এই যে, তিনি কেবল 'খাঁটি ইউরোপীয়' হওয়ার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি—হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধেও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক উগ্রতা দেখিয়েছেন। তার ফলে তাঁর 'প্রেসক্রিপশন'কে একধরনের ফিরিঙ্গিআনার নামান্তর ভাববার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ; সন্দেহ দেখা দিয়েছে : তিনিও বুঝি 'আধুনিকতা' নামে একটা নিতান্ত নেতিবাচক ও ফিরিঙ্গিগন্ধী জিনিসের প্রচারক। ভারত জুড়ে আজকাল এই 'আধুনিকতা' কথাটার খুব চল হয়েছে। যাঁরা এর প্রচারক, তাঁরাও হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে খুব উগ্রভাষায় আক্রমণ করেন। নীরদবাবুর সঙ্গে তাঁদের তফাত এই যে, তাঁর আক্রমণ 'খাঁটি সাহেবিআনা'র নামে,—অন্যদের আক্রমণ 'কস্‌মোপলিটান কালচার', 'সাম্যবাদ', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' ইত্যাদির নামে। এগুলো সবই ভালো জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, গুটিকতক ভাবুক লোকের ভাবজগৎ বা পার্টি-পলিটিক্‌সের বাইরে আমাদের দেশে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, 'কস্‌মোপলিটান কালচার' 'সাম্যবাদ,' এবং 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' আমাদের মধ্যে জীবনযাপনের কোনো ধারা ঠিক করে দেয়নি। এদেশের কোনো কমিউনিস্টকে আজ পর্যন্ত সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ত্যাগ করতে দেখা যায়নি। বিলাতের জে. বি. এস হ্যালডেনের মতো কোনো নামজাদা ভারতীয়ের কথা শোনা যায়নি, যিনি 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র অভাবে দেশত্যাগী হয়েছেন। কাজেই বলতে হয় এই ভালো জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে পার্টি-পলিটিক্‌সের জিনিস, জীবনের জিনিস নয়, এবং এই ভালো জিনিসগুলোর নামে এক শ্রেণীর লোকের যে উগ্র হিন্দু-সমাজবিরোধিতা, সে একটা সর্বগ্রাসী নেতিবাদের নামান্তর। কিন্তু নেতিবাদের দ্বারা কেউ বাঁচে না,—আমাদের মধ্যেও এই নেতিবাদের ফল হয়েছে এক ধরনের ফিরিঙ্গিআনা যার চেহারা দেখলে ভদ্রলোকমাত্রেরই বমি আসে। দেশের সর্বত্র আজ একটা মদ ও গোমাংসের 'কাল্ট্' ছড়িয়ে পড়েছে, এক মহা কদাকার বাৎস্যায়নী কেচ্ছার তাণ্ডব দেখা দিয়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন থেকে সব রকম নিষ্ঠা ও সদাচার একেবারে বিদায় নিয়েছে,—এবং যে পয়সাপূজাকে

নীরদবাবু এত ঘৃণা করেন ঘরে ঘরে তার ঘটস্থাপনা হয়েছে। নীরদবাবুর হিন্দু-বিরোধী উগ্রতা এবং 'খাঁটি ইউরোপীয়' হওয়ার উপদেশ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, এ দুটো জিনিসকে আমাদের আধুনিক সমাজের ঐ সকল গতির পক্ষে প্রশ্রয়দায়ক ভাবার আশঙ্কা আছে—তা নইলে ষষ্ঠীব্রত শ্রেণীর লেখকের সঙ্গে তাঁর নামকে কেউ দ্বন্দ্বসমাসে বাঁধবার সাহস করত না।

আমি এমন কথা বলতে চাই না যে, নীরদবাবুর 'খাঁটি ইউরোপীয়' হওয়ার তত্ত্বটা ফিরিঙ্গিআনার সঙ্গে এক। মদ ও গোমাংসের সপক্ষে তিনিও লেখালেখি করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই দুটি পরম পবিত্র পদার্থের জোরেই হিন্দুরা সভ্যতা-ভব্যতার চরম শিখরে আরোহণ করবে—এতখানি সরল-বিশ্বাস পোষণ করবার মতো মোটাবুদ্ধির মানুষ তিনি কখনোই নন। ইউরোপীয়দের বড় গুণগুলোর দিকেই তাঁর ঝোঁক—ফিরিঙ্গিআনায় তাঁর খুব বেশি ঝোঁক নেই। কিন্তু নিজের সমাজকে যিনি অত্যন্ত উগ্রভাবে আক্রমণ করার অভ্যাস করেছেন, পরের সমাজের বড় গুণগুলোও যে তাঁর আয়ত্তে আসে না, এমন দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। নীরদবাবু নিজের জীবনে 'খাঁটি ইউরোপীয়' হবার সাধনা করে অনেক বড় বড় গুণ আয়ত্ত করেছেন, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নেই; কিন্তু উগ্র হিন্দুবিরোধী হতে গেলে ফিরিঙ্গি হতে হয়, এ-দৃশ্যই আমাদের দেশে অনেক বেশি সুলভ।

আমার কথাটা যেন কেউ ভুল না বোঝেন। ইউরোপীয়দের মতো মানসিক ও নৈতিক সবলতা যে আমাদের নেই,—বিশেষ করে হিন্দুদের চরিত্রের এইটিই যে সবচেয়ে বড় ত্রুটি, সে-কথা কে অস্বীকার করতে পারে? এইটুকুই নীরদবাবুর "খাঁটি ইউরোপীয়" তত্ত্বের মূল কথা—ফিরিঙ্গিআনা তাঁর মূল কথা নয়।[১] এই মূল কথাটা সর্বতোভাবে স্বীকার্য, কিন্তু নীরদবাবুর ভ্রান্তি এই যে, হিন্দু-

১. There is no future for us Hindus unless we can recover at least our old European spirit, even if not the European body and pride of flesh. The continent of Circe, Jaico, Page 373).

সমাজের বিরুদ্ধে উগ্রভাষা ব্যবহার করেই তিনি আমাদের ইউরোপীয় আকারে গড়ে তুলতে চান। দুঃখের বিষয়, হিন্দু উপাদান থেকে ইউরোপীয় চরিত্র গড়া অত সহজ নয়। আমরা অলস, আমরা তামসিক ;—কেঁচোর মতো দীনতা-ভারাক্রান্ত আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। ইউরোপীয়েরা তেজী, তারা অকুণ্ঠশ্রমী, তারা রাজসিক—'পার্থেননের ধাবন্ত অশ্বারোহীদের' মতো জয়দৃপ্ত তাদের অন্তঃকরণ।[২] ঠিক কথা,—কিন্তু এই নানা গুণের নামের অভাবেই কি আমরা অধঃপাতে গিয়েছি? আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই, গুণের প্রতি শ্রদ্ধা কোনো দুর্লভ জিনিস নয়—আজকের এই একান্ত-অবনত ভারতবর্ষের মাটিতেও ওরকম শ্রদ্ধার অভাব নেই। আমরা ভুলে যাই, শ্রদ্ধার অভাবে কেউ মরে না, শ্রদ্ধার গোবরজল ছড়া দিয়ে আপাদমস্তক লেপা-পোঁছা করে রাখলেও 'আত্মিক হীনতার' মোচন হয় না। আমরাও ইউরোপীয় গুণের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে মরিনি। আমরা মরেছি ধর্মবিশ্বাসের অভাবে ; যে বিশ্বাস (ইউরোপীয় হোক, স্বদেশীয় হোক) জাতিধর্মনির্বিশেষে নানা গুণের অর্জনের জন্য নামযশের আশা ত্যাগ করে, প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত হয় না, ধনমানবিত্তকে পদাঘাত করে ; যে বিশ্বাস থাকলে, কেঁচোর মতো মানুষও তার দলিত-মথিত আত্মাকে একটু একটু করে উদ্ধার করতে পারে , যে বিশ্বাস না থাকলে শাল গাছের মতো শক্ত মানুষও শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী সিনিসিজ্‌মের প্রকোপে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। আগেই বলেছি, নীরদবাবুর 'ডায়েগনসিস' থেকেও এ-কথার সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব তাঁর 'ডায়েগনসিসের' সঙ্গে মিলিয়ে এই রকম চিকিৎসাপদ্ধতিই সমীচীন বোধ হয় যে, যে ধর্মজাগরণের ফলে ১৯শ শতাব্দীতে আমাদের চালচলনে একটু মানুষের মতো আকার দেখা দিয়েছিল, সেই রকম কোনো ধর্মজাগরণের মধ্যেই আমাদের মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। নীরদ চৌধুরী এই ভবিষ্যতের কোনো পথ দেখাতে পারেননি, কিন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে

---

২. Autobiography—Page 448.

বুঝিয়ে দিয়েছেন: যেদিন থেকে আমাদের মধ্যে ধর্মজাগরণের উৎসাহবেগ স্তিমিত হয়ে গেল, সেদিন থেকেই আমাদের অবনতি শুরু হয়েছে, ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর আপন হাতে গড়া সভ্যতার পতন হয়েছে।

॥ সাত ॥

এইটেই আমার মতে নীরদবাবুর সবচেয়ে বড় কীর্তি: এই পতনের কথাটা তিনি এমন চড়াস্বরে বুঝিয়েছেন যে, অনেক শ্রোতার কানের পর্দা ফেটে গেছে, অনেকের সুখনিদ্রা অকালে ভেঙ্গে গেছে। এইজন্যই তাঁর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে এত নিন্দা, এত উত্তেজনা, এত কোলাহল। আমি এমন লোককে জানি, নীরদ চৌধুরীর নাম শোনামাত্র যার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে, 'ব্লাড প্রেসার' থাকলে তার বোধ হয় 'স্ট্রোক' হয়ে যেত। বিশেষ করে 'আধুনিকতা'-পন্থীদের কাছে নীরদ চৌধুরীর নাম উচ্চারণ করা বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার সামিল। আপাতদৃষ্টিতে এটা আশ্চর্য, তার কারণ এতক্ষণ যাবৎ আমি এইটেই দেখাতে চেষ্টা করেছি যে 'আধুনিকতা'-পন্থীদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মিল আছে। যারা আমাদের দেশে ইউরোপ-আমেরিকা বা চীন-রাশিয়ার একটা সস্তা সংস্করণ খাড়া করবার জন্য ব্যাকুল, নীরদবাবুর "খাঁটি ইউরোপীয়" হওয়ার তত্ত্বে শেষ পর্যন্ত তাদেরই সুবিধা হবে। তবু যে এত লোক তাঁর নিন্দুক তার কারণ 'আধুনিকতা'-পন্থীদের আত্মসন্তুষ্টিকে তিনি 'বাহবা,' 'বাহবা' বলে খাতির করেননি। "খাঁটি ইউরোপীয়" হওয়ার প্রস্তাবটাকেও তিনি মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার দিক থেকেই দেখেছেন, সোশ্যালিজ্‌ম্ বা অন্য কোনো ইজ্‌ম্-এর দিক থেকে দেখেননি। মনুষ্যত্বের দিক থেকে দেখার ফলে 'আধুনিকতা'-পন্থীদের সম্বোধন করে তিনি সোজাসুজি বলেছেন, "আমাদের মনুষ্যত্বের আজ দারুণ অবনতি হয়েছে, তোমরাও সে অবনতির শরিক"। এমনও বলেছেন "তোমরা কেউ 'খাঁটি ইউরোপীয়' নও, তার কারণ ইউরোপীয়দের মনুষ্যত্ব ও চরিত্রের দিকটায় তোমরা জোর দাও না"। দম্ভ করে বলেছেন, "আধুনিক ভারতে

আমিই একমাত্র 'খাঁটি ইউরোপীয়'।" অবশ্য নীরদবাবু অত্যন্ত দাম্ভিক মানুষ—তাছাড়া তাঁর 'খাঁটি ইউরোপীয়' হওয়ার প্রস্তাবটাও ভুল—কিন্তু চরিত্রে যদি যথেষ্ট জোর না থাকে, নৈতিক মেরুদণ্ড যদি ইউরোপীয়দের মতো সবল না হয়, তাহলে স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে গগনভেদী স্বরে এমন কথা বলবার মতো বুকের পাটা আসবে কোত্থেকে? এই বুকের পাটার জন্যই তাঁর এত নিন্দুক। এইজন্যই যারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, খ্রীষ্টানও নয়, যারা শুধু কেবল ফিরিঙ্গি মাত্র, তাদের চোখে তিনি 'দেশদ্রোহী'। কিন্তু স্বশ্রেণীর কাছ থেকে পাওয়া এই অসম্মানই আমার মতে নীরদবাবুর সবচেয়ে বড় গৌরব। চিন্তার রাজ্যে দলপতি হওয়ার চেয়ে মানুষের মনকে জাগিয়ে দেওয়াই যে বড় জিনিস, আজকের ভারতে এ জিনিসটা আমরা তাঁর কাছেই শিখেছি। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ভুল আছে, তা থাক—কিন্তু তাঁর বুদ্ধির জাগরূকতায় ফাঁকি নেই। "অপরীক্ষিত জীবন মৃত্যুর সামিল" —সক্রেটিসের এই কথাটাকে তিনি শুধু বাঁধাবুলির মতো আওড়ে যাননি, প্রতিমুহূর্তেই কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। এইজন্যই আজকের ভারতের মনস্বী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর স্থান অদ্বিতীয়—এদেশে তাঁর জুড়ি নেই। আমাদের চিন্তাজগৎকে যদি একটা পার্লামেণ্ট সভার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে নীরদ চৌধুরী তার একমাত্র 'অপোজিশন মেম্বর',—এবং সে সভায় "পূর্ববঙ্গের এই গ্রাম্য বালকের" একার কণ্ঠস্বর একহাজার সভ্যের মিলিত কণ্ঠস্বরের চেয়েও শক্তিশালী।

———

তৃতীয় খণ্ড ঃ

॥ আজকের কথা ॥

(১৯৪৭—)

১। কমিউনিস্ট ও সেকিউলারিস্ট।

২। আধুনিক সমাজের ক্রীড্।

৩। মানবধর্মবাদ ও ধর্ম।

৪। মুক্তি কোন্ পথে ?

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টরাই আজকের ভারতের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র। এঁরা বলেন, মানবকল্যাণের উপায় হচ্ছে 'মানবধর্মবাদ' বা হিউম্যানিজ্‌ম্ এবং অগ্রগতির উপায় হচ্ছে নাস্তিকতা বা 'ব্যক্তিগত আস্তিকতা' এবং 'সমাজধারানাশিতা' বা সমাজবিপ্লব। এঁরা আরো বলেন: পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা অনুসরণের চীনজাপানী কায়দাটাই আমাদের মুক্তির পথ; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীরা যে পথ দেখিয়েছিলেন সেটা ভুল, অথবা ঠিক ভুল না হলেও চীনজাপানী পথের একটা অস্পষ্ট আভাস রূপেই তার গুরুত্ব। এসব কথা কতদূর সত্য? এগুলি কি বিনা বিচারে গ্রহণযোগ্য? কমিউনিস্ট-সেকিউলারিস্টরাই কি আজকের ভারতের মুক্তিদূত?

কমিউনিস্ট ও সেকিউলারিস্ট

নাম-সমস্যা

১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় যাঁরা সমাজ ও সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের এক ভাগের নাম ব্রাহ্ম, আর এক ভাগের নাম 'নব্যহিন্দু' বা 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু'। একথা মানতেই হবে ব্রাহ্মরা সকলেই ইংরেজিশিক্ষিত ছিলেন এবং সকল ব্রাহ্মই একযোগে হিন্দু-পরিচয় অস্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অতএব 'ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু' নামটা নির্দোষ নয়। কিন্তু ব্রাহ্মদের যারা সবচেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ তাদের আর কোনো দ্বিতীয় নাম দিয়ে চিহ্নিত করাও শক্ত, কেননা 'নব্যহিন্দু' নামটা কোনোদিনই জনপ্রিয় হয়নি। এখন এই যে পক্ষ আর প্রতিপক্ষ—এঁরাই সে যুগের বাঙলায় সমাজ ও সভ্যতার অধিনায়ক ছিলেন। প্রশ্ন করা যায়—আজকের দিনে ওরকম অধিনায়ক কারা?

একথার উত্তর, কমিউনিস্টরা আর সেকিউলারিস্টরা। কমিউনিস্টদের কথা সবাই জানে, কিন্তু 'সেকিউলারিস্ট' নামটি সন্দেহজনক। 'সেকিউলারিজ্‌ম্' আমাদের দেশে রাজনীতির একটা পরিভাষা। অশোকের আমলে যে নীতির নাম ছিল 'সমবায়', আকবরের আমলে যাকে বলত 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল,' ব্রিটিশ আমলে 'রিলিজিয়াস নিউট্র্যালিটি' বা 'রিলিজিয়াস টলারেশন' শব্দ দিয়ে যে নীতির পরিচয় দেওয়া হত—আজকের ভারতে তাকেই বলে 'সেকিউলারিজ্‌ম্'। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় 'সেকিউলারিজ্‌ম্' শব্দের আরও একটা অর্থ আছে—সেটা বরঞ্চ আরও বেশি আভিধানিক। সে-অর্থে 'সেকিউলারিজ্‌ম্' মানে 'ধর্মসমবায়' নয়,—**ধর্মকে বাদ দিয়ে শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতার কাজকর্ম চালানোর নীতি-কেই ইংরেজরা 'সেকিউলারিজ্‌ম্' বলেন**। বলা বাহুল্য, কমিউনিস্টরাও এ নীতি মানেন; অধিকন্তু তাঁরা জীবনের বাকি সব ক্ষেত্র থেকেও ধর্মকে উঠিয়ে দিতে

চান। সেকিউলারিস্টরা ততদূর যেতে চান না। কিন্তু আমাদের দেশে কমিউনিস্ট ছাড়া আর কোনো দল দেখা যায় না, যারা রাজনীতি-ব্যতিরিক্ত আর কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের 'সেকিউলারিস্ট' বলে। অনেকে নিজেদের 'প্রগতিশীল' বলে, কেউ বলে 'লিবারেল', কেউ বলে 'হিউম্যানিস্ট', কিন্তু রাজনীতির বাইরে 'সেকিউলারিস্ট' শব্দের চল নেই। অতএব প্রশ্ন উঠতে পারে—অকমিউনিস্ট ইংরেজিশিক্ষিত সমাজকে ঐ নামে চিহ্নিত করার যুক্তি কী ?

যুক্তি এই যে, কমিউনিস্টরা আজকের ভারতে একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠী হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে তাঁরা নগণ্য। অথচ সংখ্যায় যারা অনেক বেশি, সেই বৃহৎ ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের কোন সর্বজনস্বীকৃত নাম বা খেতাব নেই। 'প্রগতিশীল' নামটা অগ্রাহ্য কেননা কমিউনিস্টরাও প্রগতিশীল। দুধ আর জলের তফাত বোঝাতে যেমন দুধকে 'দুধ' এবং জলকে 'তরল' পদার্থ বলা যায় না—কেননা দুধও তাই—তেমনি কমিউনিস্ট শিক্ষিত সমাজকে 'কমিউনিস্ট' আর অকমিউনিস্ট শিক্ষিত সমাজকে 'প্রগতিশীল' বলা যায় না। 'লিবারেল' নামটাও আপত্তিকর, তার কারণ প্রথমতঃ 'লিবারেল' খেতাবটা 'সোস্যালিস্ট' খেতাবের কিঞ্চিৎ বিরোধী,—আজকের ভারতে সোস্যালিস্ট কে নয় ? দ্বিতীয়তঃ 'লিবারেল' বলতে মিল-বেন্থাম প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিকের নাম মনে আসে, আধুনিক ভারতে যাঁদের প্রভাব একেবারেই নগণ্য। শিক্ষিত ভারত আজকাল একজন মাত্র সমাজদার্শনিকেরই নাম জানে। নিজের বাপ-পিতামহের নাম যে না জানে, সেও কার্ল মার্ক্সের নাম জানে।

অতএব 'লিবারেল' খেতাব চলবে না, 'প্রগতিশীল' খেতাব চলবে না। অনেকে বলতে পারেন—তাহলে 'ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু' নামটাই চলুক। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষা আজ আর হিন্দুদেরই একচেটে নয়। তাছাড়া আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজের উনিশ শতকী প্রতিপক্ষদের ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু বলি তাহলে এযুগের হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ নাম কোনো অর্থ বহন করবে না। মনের জগতে বিশ শতকী হিন্দু আর উনিশ শতকী হিন্দু প্রায় দুই মেরুর অধিবাসী।

বরং 'হিউম্যানিস্ট' নামটা সবচেয়ে কম আপত্তিকর, কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে এখানেও একটা গোলের সম্ভাবনা আছে। সমাজ ও সভ্যতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, কারো কারো কাছে তার নাম—'সায়েন্টিফিক হিউম্যানিজ্‌ম্‌'। 'হিউম্যানিজ্‌ম্‌' আর 'সায়েন্টিফিক হিউম্যানিজ্‌ম্‌'-এ যাতে গোল না হয় তার জন্য হিউম্যানিস্ট খেতাবটা বাদ দিয়ে চলাই সমীচীন।

বাকি রইল 'সেকিউলারিস্ট'। আজকের ভারতের অকমিউনিস্ট ইংরেজিশিক্ষিত সমাজকে এই নাম দেওয়ার যুক্তি এই যে, কমিউনিস্টদের মতো পাকা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী না হলেও, শিক্ষা, সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইংরেজিশিক্ষিত ভারত আজ ধর্মকে বাদ দিয়ে চলতে চায়। অধিকাংশ ইংরেজিশিক্ষিত লোক আজ ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, ধর্মকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার দরকার নেই—কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐটুকু তাঁদের তফাত—কিন্তু সমাজ-সভ্যতা চালাতে ধর্মের কোনো আবশ্যকতা নেই। কিরকম সমাজ, কিরকম সভ্যতা তাঁরা চান সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েই আজকের ভারতের অকমিউনিস্ট শিক্ষিত সমাজকে 'সেকিউলারিস্ট' নাম দেওয়া যায়। অবশ্য নামের কোনো স্বতন্ত্র মহিমা নেই—বাপ-মা কানা ছেলেরও নাম রাখে পদ্মলোচন। কিন্তু আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিটা বোঝাবার জন্যই এতগুলি কথা বলতে হল। দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকলে 'প্রগতিশীল', 'লিবারেল', 'হিউম্যানিস্ট' অথবা আর যে-কোনো নাম দিলেও কাজ চলে যেতে পারে।

সেকিউলারিস্টরা কী চান

সেকিউলারিস্টদের 'দৃষ্টিভঙ্গির' পরিচয় পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তাঁদের ভাবধারার পরিচয় কী? কিরকম সমাজ, কিরকম সভ্যতা তাঁরা চান? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কমিউনিস্টরা যেমন জোর দিয়ে বলতে পারেন: আমরা কী চাই তা আমরা জানি; আমরা চাই একটা শ্রেণীহীন সমাজ; আমরা

চাই এমন এক সভ্যতা যার উপাদান হবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প, যার বীজমন্ত্র হবে বিপ্লব, যার মানবসম্পর্কের গ্রন্থি হবে এক ধরনের জঙ্গী বিশ্বভ্রাতৃত্ব*—সেকিউলারিস্টরা তেমন কিছু বলতে পারেন না। কী তাঁরা চান না তা বরঞ্চ কতকটা বোঝা যায়। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম চান না আবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজও চান না। তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের ধর্মশাসিত সমাজও চান না, আবার কমিউনিস্টদের সবলে-ধর্ম-উচ্ছেদকারী সভ্যতাও চান না। তবে তাঁরা চান কী?

এ প্রশ্নের মধ্যে আমাদের জাতীয় মনের যে দিশেহারা অবস্থার আভাস পাওয়া যায়, আজকের ভারতের সমাজ ও সভ্যতার রূপ সম্বন্ধে তা একটা বড় ইঙ্গিত। নেতিবাদ ও নঞর্থক ভাবধারাই আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বড় লক্ষণ। নৈরাশ্য, অনিশ্চয় এবং অনির্দেশ্যতাই আমাদের সকল প্রচেষ্টার আনুষঙ্গিক। কিন্তু কোনো নেতিবাদই সর্বাঙ্গীণ নেতিবাদ হতে পারে না। যে অনবরত না-রাম, না-গঙ্গা বলে সেও একটু একটু করে রাবণের দিকে টানে, গঙ্গাহীনতার দুর্ভাগ্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সেকিউলারিস্টদের নঞর্থক ভাবধারার মধ্যেও কিছু সদর্থক ইঙ্গিত আছে। কিসের ইঙ্গিত সেইটিই এখন বিবেচ্য।

কমিউনিস্ট ও সেকিউলারিস্ট

সেকিউলারিস্টদের নঞর্থক ভাবধারার মধ্যে সদর্থক ইঙ্গিত হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজ ও কমিউনিস্ট সভ্যতা—যে কমিউনিস্ট সমাজ ও যে কমিউনিস্ট সভ্যতা গড়তে রক্তারক্তি হবে না। অবশ্য রক্তারক্তিহীন কমিউনিস্ট সমাজ সম্ভব কিনা সে একটা বড় প্রশ্ন, কিন্তু সেকিউলারিস্টরা তাই চান। অনেকে একথা শুনলে আশ্চর্য হবেন, তার কারণ ভারতের লক্ষ-লক্ষ সেকিউলারিস্টের মধ্যে খুব কমসংখ্যক

* কমিউনিস্ট বিশ্বভ্রাতৃত্বকে জঙ্গী বলা হচ্ছে, কেন না বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানরা যে ধরনের বিশ্বভ্রাতৃত্ব চান, তার সঙ্গেই এর একেবারে মৌলিক তফাত আছে। কমিউনিস্টরা লড়াই করেই 'ব্রাদারহুড্ অব্ ম্যান্' প্রতিষ্ঠা করতে চান—বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানরা তা চান না।

ব্যক্তিই সোজাসুজি কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রশংসা করেন। অনেকে 'শিল্পীর স্বাধীনতা', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' প্রভৃতি স্লোগানের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে বলেন, কমিউনিস্ট সমাজে ঐ সমস্ত দামী জিনিসের অস্তিত্ব নেই। অনেকে বলেন, কমিউনিস্ট সমাজ টোটালিটারিয়ান বা সর্বগ্রাসী। কিন্তু মুখে যিনি যাই বলুন, অবস্থার গতিরোধ করা সেকিউলারিস্টদের সাধ্য নয়। অবশ্য তার অনেক কারণ আছে, কিন্তু নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে: তাঁদের কোনো প্রামাণিক মতবাদ নেই। অ্যাংলো-স্যাক্সন দুনিয়ায় যেমন 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' একটা স্বীকৃত মতবাদ, ভারতে সেরকম নয়। ভারতের সেকিউলারিস্ট ডিমক্র্যাসির কথাও বলেন, আবার সোশ্যালিজ্‌ম্‌ও চান,—যখন-তখন যে কোনো ব্যাপারে 'ন্যাশানালাই-জেশনে'র দাবিও তোলেন। 'খবরের কাগজের স্বাধীনতা'ও চান আবার গবরমেন্টের টাকা-ছড়ানো বিজ্ঞাপনও চান। 'শিল্পীর স্বাধীনতা'ও চান আবার এ্যাকাডেমি ইত্যাদি পুরস্কারও চান।—এই পরস্পরবিরোধী দাবির চাপে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর স্বার্থই প্রশ্রয় পেতে থাকে—'ব্যক্তিস্বাধীনতা' মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। এইজন্য মনে করি, দুনিয়াজোড়া লালফৌজের শোভাযাত্রায় ভারতের সেকিউলারিস্ট-এর ভূমিকা নিরস্ত্র বিউগিল-বাদকের ভূমিকা মাত্র—আর কিছু নয়।

আমি যে একটা মনগড়া কথা বলছি না, আজকের ভারতের সমাজ ও সভ্যতার গতির দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আজকের ভারতে কিরকম সমাজ কিরকম সভ্যতা গড়ে উঠছে? কমিউনিস্টরা শ্রেণীহীন সমাজ চান, সেকিউলারিস্টরা চান না-হিন্দু না-মুসলমান সমাজ। ভাষার দিক দিয়ে এ দুটোতে তফাত থাকতে পারে, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে সেকিউলারিস্টরা কি শুধু কমিউনিস্টদের পথই পরিষ্কার করেন না? সত্যি সত্যি তো না-হিন্দু না-মুসলমান নামে কোনো সমাজ হয় না। এরকম নীতির দ্বারা বড়জোর দুটো প্রাচীন সমাজই ধ্বংস হতে পারে—সৃষ্টি কিছুই হতে পারে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমান দুই সমাজই যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসবে কে? সেকিউলারিস্টদের মতো যাঁরা

কেবল 'না'-ধর্মী মতবাদ প্রচার করেন তাঁরা নিশ্চয়ই নয়। শূন্যস্থানে আসবেন কমিউনিস্টরা তার কারণ তাঁদের মতবাদই স্পষ্ট, সরল এবং হাঁ-ধর্মী। অন্ততঃ এটুকু মানতেই হবে, সমাজের শক্তি যত কমবে রাষ্ট্রের শক্তি তত বাড়বে। কাজেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সেকিউলারিস্টদের যেটা সবচেয়ে বড় নালিশ—রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসিতা ঘটিত নালিশ—সেটা তখন অতি সহজেই সত্যে পরিণত হবে, কমিউনিস্ট জুজুর বিরুদ্ধে 'টোটালিটারিয়ানের' কাঁদুনি গেয়ে হালে পানি পাওয়া যাবে না। কার্যতঃ হচ্ছেও তাই। আমাদের দেশের সেকিউলারিস্টরা সচরাচর হিন্দু। তাঁরা মুসলমান সমাজ ধ্বংস করতে পারেননি; শরিয়তের প্রাচীন ও পাকা স্তম্ভের উপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীরগাত্রে তাঁরা দন্তস্ফুটও করতে পারেননি। কিন্তু হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতি আজ রাষ্ট্রের আইনে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সকলেই জানে ঐ সমস্ত আচার-ব্যবহার-রীতিনীতির সবগুলোই ভাল ছিল না। সতীদাহ-জাতিভেদ-ছুঁৎমার্গের কথা আজ কে না জানে? বিধবাবিবাহের আইন, ডিভোর্সের আইন, 'শিডিউল্ড্ কাস্ট'-এর সমানাধিকারের আইন এবং আরো নানা আইনের অপার মহত্ত্বের কথাও কে অস্বীকার করতে পারে? সবই ঠিক কথা, কিন্তু এসবের দ্বারা হিন্দুসমাজ যে আজ রাষ্ট্রের আইনে বাঁধা পড়ে গেছে, একথাও তো অস্বীকার করা যায় না।—সাহেবরা বলেন: Better dead than red।—আমাদের সেকিউলারিস্টরাও মাঝে মাঝে লালাতঙ্কের কাঁদুনি গেয়ে থাকেন।—কিন্তু কমিউনিস্টদের মোনোলিথিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এরকম সমাজনাশী রাষ্ট্রের তফাত কী?

তীক্ষ্নদর্শী লোক বলবেন: তফাত আছে বৈকি। কমিউনিস্টরা সমাজ ধ্বংস করলেও এমন কায়দায় রাষ্ট্র গড়ে যা দিয়ে সমাজের কার্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হয়। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কেবল আইন প্রণয়ন করে না, দেশের লোকের উপর একধরনের নীতি বা 'মূল্যবোধ'ও চাপিয়ে দেয়। চীন-রাশিয়ার কমিউনিস্টরা কম বয়স থেকেই কতকগুলি মূল্যবোধে অভ্যস্ত হয়। তারা ট্রাম পোড়ায় না, ওয়াগন ভাঙে না, যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে না। কাজেই 'কমিউনিস্ট সমাজ' কথাটার

একটা অর্থ আছে, যদিও সে সমাজ আসলে রাষ্ট্র মাত্র। 'সেকিউলারিস্ট সমাজ" কথাটা সোনার পাথরবাটি। এ সমাজে 'সামাজিক' বিধিনিষেধও নেই, (কেননা বিধিনিষেধের নিয়ামক আজ আইন বা রাষ্ট্র) মূল্যবোধও নেই (কেননা মূল্যবোধের কোনো নিয়ামকই নেই)। ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক ট্রামও পোড়ায়, ওয়াগনও ভাঙে, গোটা দেশটাকে মূত্রাগারে পরিণত করতে লজ্জা পায় না। হিন্দুসমাজ-ধ্বংসের ফলে ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধ দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে; সাত্ত্বিক জীবন, দয়াদান-ত্যাগ-তিতিক্ষা, পিতৃমাতৃশুশ্রূষা প্রভৃতি মূল্যবোধ বিলীয়মান হয়েছে। কিন্তু এই সমাজনাশী রাষ্ট্র কোনো নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে না, সমস্ত কিছুই জনগণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার হাতে ছেড়ে দেয়। এইটুকুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সেকিউলারিস্ট রাষ্ট্রের তফাত। মন্দের দিকে তফাত নেই। এরাষ্ট্রও সমাজনাশী, সর্বগ্রাসী; ও রাষ্ট্রও সমাজনাশী, সর্বগ্রাসী। তফাত শুধু ভালোর দিকে।

(২) এমনি করেই আমাদের সেকিউলারিস্টরা কমিউনিস্টদের পথ পাকা করছেন। কিন্তু শুধু কি সামাজিক ভাবধারায়? আরেকটা কথা আজকাল খুব বেশি শোনা যায়ঃ "আধুনিক সভ্যতা"। সেকিউলারিস্টদের এই 'আধুনিক সভ্যতার' তত্ত্বটা কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতিধ্বনি মাত্র। ব্রাহ্ম ও "ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভাল জিনিসগুলো বেছে নিয়ে বাঙলাদেশে একটা সভ্যতার পত্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যেও 'আধুনিক সভ্যতা' কথাটার চল ছিল। কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্মরা যখন এই শব্দটা ব্যবহার করতেন, তখন 'আধুনিক' কথাটা দিয়ে তাঁরা বিশেষ করে 'বিজ্ঞান' বুঝতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের বাইরে সভ্যতার অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে 'আধুনিকতার' গোঁড়ামি ছিল না। বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেগুলো 'প্রাচীন' উপাদান, স্থায়ী ও সুপরীক্ষিত উপাদান, সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান, সেগুলির উপরে তাঁরা অনেক বেশি জোর দিতেন। মনে করুন মাইকেল। হিন্দু-ব্রাহ্ম যুগের এই কবিকে আমরা নূতন বাঙলা সাহিত্যের পথপ্রদর্শক মনে করি। কিন্তু তাঁর কাব্যের মডেল ছিলেন হোমার-মিল্টন-বাল্মীকি—তাঁর ট্র্যাজিডির মডেল

ছিলেন সেক্স্‌পীয়র। অর্থাৎ নূতন বাঙলা সাহিত্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যেগুলো ক্লাসিক সেগুলো থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিল। মাইকেল বড় কবি কিনা সে-কথা এখানে বিচার্য নয়, কিন্তু তিনি যে নূতন বঙ্গসাহিত্যের পথপ্রদর্শক সেটাই বিচার্য। তাঁর ঐ পথপ্রদর্শনপদ্ধতির পিছনে যে নীতির প্রেরণা ছিল সে একটা সুপরীক্ষিত নীতি। সে নীতির চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছিল ইতালীর রেনেসাঁস থেকে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশো বছরের ইউরোপীয় ইতিহাসে। এই চারশো বছরের ইউরোপের শিক্ষাপদ্ধতি গ্রীক-ল্যাটিনের পাকা বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন সভ্যতার যেটুকু স্থায়ী উপাদান তারই উপর ভিত্তি খাড়া করে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার পত্তন। স্থায়ী, সর্বজনগ্রাহ্য ও সুপরীক্ষিত প্রাচীনের মূল ছাড়া নবীন সভ্যতা দাঁড়াতে পারে না—এইটেই চারশো বছরের ইউরোপের শিক্ষা। আজকের সেকিউলারিস্ট ভারতে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রতি একান্ত বশংবদতা ছাড়া এটার কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

কমিউনিস্টরা বলেন: সভ্যতার কোনো স্থায়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য উপাদান নেই, কাজেই 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা', 'ভারত সভ্যতা',—এই সমস্ত শব্দকেও তাঁরা অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেন। তাঁদের মতে সভ্যতা এক-একটা যুগের জিনিস —এক-একটা শ্রেণীর সৃষ্টি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্রেণীটা তার পূর্বগামী শ্রেণীর চেয়ে প্রগতিশীল বা শ্রেষ্ঠতর। এই যুক্তিতে শ্রমিক শ্রেণীর সভ্যতা দাস সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। গ্রীকদের সভ্যতা দাস সভ্যতা, কাজেই এই যুক্তিতে গ্রীক সভ্যতা আধুনিক রুশ সভ্যতার চেয়ে নীচু দরের। কথাটা এমনভাবে বলা যায় যে, ম্যাক্সিম গোর্কি সোফোক্লিসের চেয়ে বড় লেখক, সুকান্ত কালিদাসের চেয়ে বড় কবি। একথা ঠিক, কোনো কমিউনিস্টই অতখানি স্থূল ভাষায় তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন না। এমন কি আমাদের দেশেও, সুকান্ত-কালিদাসের তুলনাটা আজো কাগজে-কলমে ছাপা হয়ে বেরোয়নি। এমনও বলা যায়: গ্রীক-ল্যাটিন ক্লাসিক সম্বন্ধে আমাদের কমিউনিস্টরা স্পষ্ট করে কিছু বলতে সাহস করেন

না। কিন্তু সংস্কৃত যে একটা প্রতিক্রিয়াশীল ভাষা এবং প্রাচীন হিন্দুদের সভ্যতা যে একটা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাপার, এমন ইঙ্গিত কমিউনিস্টদের লেখায় সুলভ। এমনধারা মতামত প্রকাশে কারো সঙ্কোচ নেই।

সেকিউলারিস্টদের সম্বন্ধেও একথা সত্য। আমি কেবল সাহিত্যের কথাই বলছি না। কিন্তু আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীর সাহিত্যে-শিল্পে, আচারে-আচরণে, জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে 'আধুনিক সভ্যতা' কথাটার উপর এমন একটা জোর দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, যা প্রাচীনের প্রেরণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তবে এর দ্বারা যে কমিউনিস্ট সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে, সেও ঠিক খাঁটি কমিউনিজ্‌ম্-এর সভ্যতা নয়, কেননা কমিউনিস্ট সভ্যতার গোড়ার জিনিসটাই এতে নেই। কমিউনিস্টরা শ্রেণীচেতনার মাপকাঠি দিয়ে এমন সভ্যতা গড়তে চান, যার শুরুতে থাকবে সর্বহারার কল্যাণ এবং যার পরিণতিতে আসবে শ্রেণীহীনতা। সেকিউলারিস্টরা এমন কোনো মাপকাঠি স্বীকার করেন না। তাঁরা হিন্দুব্রাহ্মযুগের মাপকাঠিও স্বীকার করেন না আবার শ্রেণীচেতনার মাপকাঠিও স্বীকার করেন না। 'যে দেশের যে কিছু জিনিস ভালো, সাহিত্যশিল্পের যেগুলো ক্লাসিক, মনুষ্যত্বের যে সমস্ত প্রকাশ সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক, তারই মাপকাঠি দিয়ে নূতন সভ্যতা গড়া যায়'—হিন্দুব্রাহ্মযুগের এ বিশ্বাস তাঁরা বর্জন করেছেন; আবার কমিউনিস্টদের বিশ্বাসও তাঁরা নেননি। এই মাপকাঠিবিহীন, উদ্দেশ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্ত ও উদ্‌ভট সভ্যতার দিকেই আজকের ভারতসমাজের গতি এবং সেকিউলারিস্টরা এরকম আধুনিক সভ্যতারই পৃষ্ঠপোষক।

উপসংহার

যে অনির্দেশ্যতা আধুনিক ভারতসমাজের একটা বড় লক্ষণ, আমাদের জীবনের অন্তত: দুটি ক্ষেত্রে সে অনির্দেশ্যতার ছাপ নেই। আমাদের সমাজ ও সভ্যতার অধঃপতনের গতি সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট এবং দিনে-দিনে তার যে বেগবৃদ্ধি ঘটছে তার মধ্যেও কোনো অনির্দেশ্যতা দেখা যায় না। সেকিউলারিস্ট 'জীবন-

দর্শন' আমাদের সমাজের সর্বোচ্চ স্তরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে—নিম্নতর স্তরের দিকেও তার গতিবেগ ক্রমবর্ধমান। এই জীবনদর্শনের ফল কী—এ প্রবন্ধে আমি তার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য আজ সম্পূর্ণ নিদ্রাচ্ছন্ন বা অভিভূত। এমন লোকের সংখ্যা আজ অজস্র যাঁরা মনে করেন এই জীবনদর্শনের দ্বারাই আমরা সমাজ-সভ্যতায় বড় হব, মহৎ হব, সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করব। এর থেকে বোঝা যায়, অন্ধবিশ্বাস কেবল রক্ষণশীলতার গাছেই ফলে না, প্রগতির গাছেও তার ফলনের প্রাচুর্য দেখলে দুচোখ জুড়িয়ে যায়।

আধুনিক সমাজের ক্রীড্

গত একশো বছরের বাঙালীর ইতিহাস যাঁরা ভালোভাবে অনুশীলন করেছেন তাঁরা জানেন স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকেই বাঙালী জীবনে একটা মানসিক ও নৈতিক অবনতির সূচনা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মবিষয়ক ভাবধারার প্রভাব তখন থেকে কমতে শুরু করে,—রাজনীতি এসে জাতীয় জীবনে একচ্ছত্র হয়ে বসে। গান্ধীজীর আন্দোলনকে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না, কিন্তু তাঁর সমাজ ও ধর্মের আন্দোলন বাঙালীজীবনে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে পূর্বোক্ত মানসিক ও নৈতিক অবনতির স্রোত ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।—আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে সেই অবনতির স্রোতেই মজ্জমান।

এই মানসিক ও নৈতিক অবনতির সবচেয়ে বড কারণ—(১) দেশের ক্রমবর্ধমান 'নাস্তিকতা' এবং (২) দেশের সর্বত্র প্রাচীন সমাজধারা সম্বন্ধে একটা উগ্র বিমুখতার ভাব। স্বাধীনতার পর থেকে এই দুটি ভাব ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটা 'কাল্ট'-এ পরিণত হয়েছে। ইংরেজিশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও যে এগুলোর ছাপ পড়েনি তা নয়, কিন্তু হিন্দুসমাজে এগুলি অনেক বেশি শক্তিশালী। আজকের ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, তাঁদের বিশ্বাস, ধর্মসম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ঔদার্য আনতে গেলে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন কিংবা (কমপক্ষে) নিঃস্পৃহ হতে হয় এবং প্রাচীন সমাজ-ধারাকে এককালে (কিংবা ধীরে ধীরে) উচ্ছেদ না করতে পারলে 'সাম্য' ও 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র বিকাশ হয় না; তার চেয়ে বড কথা, 'আধুনিক সমাজ' গড়া যায় না। এইটেই আজকের ভারতের উচ্চশিক্ষিত সমাজের ক্রীড্ এবং 'নাস্তিকতা' ও 'সমাজধারানাশিতা' এই ক্রীডের অপরিহার্য অঙ্গ। "সমাজ-ধারানাশিতা" শব্দটা অনেকের কাছে অচেনা লাগতে পারে। চেনা শব্দ হচ্ছে

'সমাজবিপ্লব', কিন্তু এ-শব্দ বিশেষ করে কমিউনিস্টরাই ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষিত ভারতের সামাজিক মতামতের পরিচয় দিতে হলে এমন একটা শব্দ চাই যা অকমিউনিস্টদের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য। 'সমাজধারানাশিতা' শব্দটা নূতন হলেও এর অর্থ নিয়ে কোনো গোল নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মদ ও গোমাংস খাওয়ার ব্যাপারে আজকের অনেক হিন্দুই উদারনৈতিক ভাবের পক্ষপাতী। এই রকম উদারনীতিকেই সমাজধারানাশী বলা যায় এবং একথা কেবল হিন্দুসমাজধারা সম্বন্ধে সত্য নয়, মুসলমান সমাজধারা সম্বন্ধেও সমান সত্য। মদ-গোমাংস সামান্য জিনিস, কিন্তু এই সামান্য দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়, নাস্তিকতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজধারানাশিতাকেও 'আধুনিক সমাজের ক্রীডে'র অঙ্গ বলা উচিত। আজকের ভারতের মানসিক ও নৈতিক অবনতির মূলে এই ক্রীডের প্রভাব যাচাই করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অন্যদেশের যুক্তি

কিন্তু আলোচনার গোড়াতেই একটা কথা স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। আজকের চীন-রাশিয়া এই ক্রীড পুরোপুরি মেনে নিয়েছে। তারাও বৌদ্ধ, কনফুসীয় এবং খ্রীস্টান 'সমাজধারাকে' পরিত্যাগ করেছে। অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চীন-রাশিয়া আজ ভারতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতিশীল। ইউরোপ-আমেরিকাতেও আজ খ্রীস্টধর্মমূলক ভাবধারা এই ক্রীডের তুলনায় দুর্বল, অথচ তারাও ভারতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতিশীল। এ দুটো উদাহরণকে অনেকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে বলতে পারেন: এরাই ঐ ক্রীডের মাহাত্ম্যের প্রমাণ। কিন্তু সাময়িক উন্নতিশীলতার উদাহরণ কোনোমতেই একটা ক্রীডের সপক্ষে যুক্তি হতে পারে না, সেক্ষেত্রে হিটলারের জার্মানির অভূতপূর্ব উন্নতিশীলতাকেও নাৎসীবাদের মাহাত্ম্য-প্রমাণে কাজে লাগানো যেতে পারত। আমি জানি, আজকের যে কোনো জ্ঞানবৃদ্ধ এবং অজাতশ্মশ্রু বালকও অকুতোভয়ে বলে উঠতে পারে: শেষ পর্যন্ত নাৎসিবাদের পাপেই কি হিটলারের জার্মানি ধ্বংস হয়নি? কিন্তু দুঃখের বিষয়,

এই জ্ঞানবৃদ্ধেরাই আবার ভুলে যায়, আজকের চীন-রাশিয়া এবং ইউরোপ-আমেরিকা সম্বন্ধেও এ-যুক্তির জোর সমান,—আগামীকাল তারাও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সে অঘটন না ঘটুক। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি: চীন-রাশিয়ার আরো অনেক বেশি বাড়বাড়ন্ত হোক, অচলপ্রতিষ্ঠ হোক ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যাহ্নগৌরবসূর্য। কিন্তু আধুনিক সমাজের ক্রীডের ভালোমন্দ বিচারে ইউরোপ-আমেরিকা এবং চীন-রাশিয়ার যুক্তি অচল।

আধুনিক সমাজের ক্রীড্—সমাজধারানাশিতা

"প্রাচীন সমাজধারার উচ্ছেদ করে, ভারতে সাম্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক আধুনিক সমাজ পত্তন করতে হবে"—এই ক্রীডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি এই যে, সমাজধারানাশিতার দুটো অত্যন্ত মারাত্মক ফল আছে, এবং কেবল আধুনিক ভারতে নয়, আধুনিক পৃথিবীর সর্বত্রই এই দুটো ফল আমরা অল্পবিস্তর প্রকট দেখতে পাই। প্রথম ফল 'টোটালিটারিয়ান' রাষ্ট্র—যে রাষ্ট্র কেবল দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেই ক্ষান্ত হয় না, মানুষ কিভাবে চলবে ফিরবে, কেমন করে জীবন যাপন করবে, মনের আনন্দ ও উদ্ভাবনাশক্তিকে কিরকম সৃষ্টিতে ব্যক্ত করবে, কী প্রণালীতে অবসর-বিনোদন করবে—সব কিছুকেই নিক্তির ওজনে ধরে বেঁধে দেয়। যে রাষ্ট্র সাহিত্যিককে করে মোসাহেব, বৈজ্ঞানিককে করে ক্রীতদাস, গায়ককে করে চরণ-চারণ-চক্রবর্তী এবং বিরুদ্ধবাদী মাত্রকেই পাঠায় "কনসেনট্রেশন ক্যাম্প"-এ—সমাজধারানাশের প্রথম ফল হচ্ছে সেই রকম রাষ্ট্র। কিন্তু সমাজধারানাশের দ্বিতীয় ফলটাই যে কিছু ভালো সে কথাও বলা যায় না। তার কারণ, এই দ্বিতীয় ফল হচ্ছে, ব্রাহ্মণ বা চার্চের শাসনের বদলে খবরের কাগজ, সিনেমা বা দলের শাসন, অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধির শাসনের বদলে হুজুগের শাসন, ধর্মশাসনের বদলে ডামাডোলের শাসন, তপস্বীর শাসনের বদলে ডিম্যাগগের শাসন। এই দুটো ফলের কথাই একটু সবিস্তারে বোঝানো যাক।

(১) 'সমাজধারানাশের প্রথম ফল টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র', অনেকের কাছেই এ জিনিসটা আশ্চর্য লাগতে পারে। বাস্তবিক, সেলিম মিঞা মদ খেতে শুরু করেছে আর নিবারণ চক্রবর্তী গিলছে রোস্টবীফ—এইটুকুর জোরে সেলিম-নিবারণকে লেনিন-মাও-সেতুং-এর আসনে বসানো যায় না। বাস্তবেও দেখা যায়, কমিউনিস্টদের যারা দিবারাত্র 'টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রপন্থী' বলে গাল দেয়,—মদ-গোমাংসের ব্যাপারে পরমতম ঔদার্যের ভাব প্রকাশ করতে তাদেরও এতটুকু আপত্তি নেই। এমনকি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নাম শুনে যারা ঘামতে শুরু করে, 'সমাজব্যবস্থার আমূলপরিবর্তনে'র কমিউনিস্ট বুলিটাকে তারাও অনেকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়। কিন্তু একটু তলিয়ে বুঝলে দেখা যায়, সর্বনাশের গোড়া হচ্ছে এই বিশেষ বুলিটাই, বিপ্লব এর তুলনায় অনেক নিরীহ জিনিস। সেলিম-নিবারণকে আমরা রেহাই দিতে পারি, কিন্তু "সমাজব্যবস্থার আমূল-পরিবর্তন" টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র ছাড়া হয় না। একটা সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমাজের আমূল-পরিবর্তন অসম্ভব এবং তেমন প্রতিষ্ঠানকেই তো বলে টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র। একথা ঠিক, সর্বগ্রাসী প্রতিষ্ঠানের দ্বারাও প্রাচীন সমাজের অনেক অন্যায় দূর হয়ে ন্যায় আসতে পারে, বৈষম্য দূর হয়ে আসতে পারে সাম্য এবং কুপ্রথা দূর হয়ে আসতে পারে সুপ্রথা। কিন্তু সে ন্যায়, সে সাম্য সে সুপ্রথা জেলখানার কয়েদীর ন্যায়, জেলখানার কয়েদীদের সাম্য এবং জেলখানার কয়েদীদের সুপ্রথার নামান্তর, চরম বৈষম্য-মূলক সমাজও তার চেয়ে ভালো। আজকের ভারতের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, যাদের ভিতর থেকে এই স্লোগানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী আপত্তি ওঠার কথা ছিল, সেই হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল-পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি শব্দায়মান। এরা হাজার হাজার বছরের শিক্ষা রাতারাতি ভুলে গেছে। এরা ভুলে গেছে প্রাচীন হিন্দুসমাজ ছিল স্মৃতিশাস্ত্রের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—সেটাকে 'টোটালিটারিয়ান' সমাজ বললে অন্যায় হয় না। মনু বলেন ব্রাহ্মণের জীবনে অর্থাৎ—সমাজের যারা চালক, তাদের জীবনে—গর্ভনিষেক থেকে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত

হবে তন্ত্রেমন্ত্রে এবং গোটা সমাজটাকেই তারা তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে চালাবে। এই প্রাচীন কুসংস্কার থেকে আজ আমরা মুক্ত হয়েছি। কিন্তু 'টোটালিটারিয়ান' সমাজের বদলে গড়তে চাচ্ছি 'সমাজধারানাশী রাষ্ট্র' অর্থাৎ কিনা টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র। কথাটা এইভাবে বলা যায় : পুরুত বামুনের উপদ্রব শেষ হতে না হতেই আমরা চাচ্ছি 'সীক্রেট পুলিসে'র ডাণ্ডা আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মগজধোলাই। এমনধারা ক্রিয়াকলাপকেই কি ইংরেজিতে 'হাঁড়ির আগুন থেকে চুল্লীর আগুনে' ঝাঁপ দেওয়া বলে না ?

(২) সে যাই হোক, সমাজধারানাশের এই প্রথম ফলটা আজো আমাদের দেশে পাকতে শুরু করেনি, কাজেই 'টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র' ঘটিত আলোচনাটিকে নিয়ে বাগ্‌বাহুল্যের দরকার নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত জুড়ে আরেকটা জিনিস ঘটতে শুরু করেছে সেও কিছু কম ভয়ের নয়। সমাজধারানাশের যে দ্বিতীয় ফলের কথা বলেছি, আজকের ভারতে সেই নৈতিক বিশৃঙ্খলার দিকটাই অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠছে। দেশ থেকে সমাজশাসন আজ খর্ব হয়ে যাচ্ছে—সেখানে এসেছে খবরের কাগজ, সিনেমা আর দলের শাসন। কমিউনিস্ট সেকিউলারিস্ট দুই সম্প্রদায়ই এর পথ পরিষ্কার করছেন। কমিউনিস্টরা করছেন কৃষক-শ্রমিক ও শূদ্রজাতির নামে, সেকিউলারিস্টরা করছেন গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বড় বড় আদর্শের নামে।

যারা এই ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদির কথা বলে প্রাচীন সমাজের 'নাগপাশের' বিরুদ্ধে অনবরত আক্রমণ করে, তারা একটা কথা ভুলে যায়। তারা ভুলে যায়, ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের জন্য কেবলমাত্র 'নাগপাশহীনতা' কাম্য নয়—কাম্য একটা 'সমাজ' অর্থাৎ জীবনযাত্রার একটা সর্বজনীন গতিপথ। যে দেশের জীবনযাত্রায় এই সর্বজনীন গতিপথ নেই সে দেশের কোনো বিবেকবুদ্ধিই থাকতে পারে না, কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা কতটুকু থাকতে পারে সেটা অতিসহজেই অনুমেয়। যখনকার যে স্লোগানটা সবচেয়ে চড়া স্বরে শোনা যায়, সে দেশের লোক তারই কাছে দাসখত লিখে দেয়। তারা খবরের কাগজ থেকে আনে 'কালচার' ও শিক্ষা,

সিনেমা থেকে আনে নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধ, দল থেকে আনে সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনের পথ ও পাথেয়। চরিত্র ও মনের দিক দিয়ে তারা একদম 'বাজারে' হয়ে যায়—বেশ্যাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো তফাত থাকে না। যত কঠোরই শোনাক, আজকের ভারতে ঠিক এই জিনিসটাই ঘটছে।

কেমন করে ঘটছে সেটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে যদি আমরা বলি যে, মনুর সমাজ বড় ভালো ছিল, তাহলে কেবল বিদ্রূপভাজন হতে হবে। কিন্তু এটুকুও তো স্বীকার করতে হবে যে, মনুর সমাজে একদিকে যেমন শাসনের নাগপাশ থেকে অব্যাহতি ছিল না, আরেকদিকে তেমনি জীবনযাত্রার একটা সর্বজনীন গতিপথেরও অস্তিত্ব ছিল। ক্রিয়াকর্ম, অতিথিসেবা, দানধ্যান, তীর্থযাত্রা, গঙ্গাস্নান—এই সমস্ত নিয়ে ছিল হিন্দুদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। বাপ-মায়ের প্রতি ভক্তি, স্বামীর প্রতি ভক্তি, গার্হস্থ্য জীবনে সত্যরক্ষার দৃঢ়তা এবং প্রতিদিন পৌরাণিক মহাপুরুষদের স্মরণ-কীর্তন—এগুলো ছিল শত শত হিন্দুপরিবারের সজীব আদর্শ। কেবল নরহত্যা নয়, যে কোনো প্রাণিহত্যা সম্বন্ধেই নৈতিক শাসন, ধর্মোৎসবের বাইরে মাংসাহার সম্বন্ধেও সঙ্কোচ, সাংসারিক প্রতিষ্ঠা এবং ভোগবিলাস সম্বন্ধে দ্বিধালজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং কৌমার্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ফললিপ্সাহীন সৎকর্মের মহিমা-স্বীকার—এগুলো ছিল সর্বস্তরের হিন্দুর বিবেকবুদ্ধির নিয়ামক। নাগরিক ভারত থেকে এসব আদর্শ আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বদলে এসেছে কোন্ জিনিস? হিন্দুসমাজধারানাশী হিন্দুরা বলছেন: আমরা পুরুত-বামুন-শাসিত সমাজ চাই না, চাই এমন পরিবেশ, যাতে থাকবে অঢেল ব্যক্তিস্বাধীনতা, যে ব্যক্তিস্বাধীনতার জোরে মানুষ আপনা-আপনি বড় হবে, মহৎ হবে, সার্থক হবে। কিন্তু আজকের ভারতে এই বড়ত্ব-মহত্ত্ব-সার্থকতার পরিচয়টা কি কেউ তলিয়ে দেখেছেন? যদি আমরা পুরুত-বামুন-শাসিত অসভ্য ভারতের একজন সাধারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আজকের সুসভ্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রধান ভারতের একজন

সাধারণ ভদ্রলোকের তুলনা করি, তবে কী দেখতে পাই ? দেখতে পাই, আগের মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়েও জিতেন্দ্রিয়তার ভান করত অথচ বহু সন্তানের জননীকে বলত 'রত্নগর্ভা'। আজকের মানুষ জিতেন্দ্রিয়কে ভাবে 'ক্লীব' অথচ তিনের বেশি সন্তানের বাপ-মাকে ভাবে 'রিঅ্যাক্‌শনারি'। আগের মানুষ অধার্মিক হয়েও যেত হরিসভায়, আজকের মানুষ 'সংস্কৃতিহীন' হয়েও যায় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে। আগের মানুষ ঘোর মাংসাশী হয়েও গোমাংস শুনলে কানে আঙুল দিত। আজকের মানুষ ঘোর নিরামিষাশী হয়েও গোমাংস না খাওয়াকে ভাবে বর্বর সমাজের লক্ষণ। আগের মানুষ ধার্মিককেই ভাবত অবতার, কাজেই বকধার্মিককে ভক্তি করেও তারা প্রতারিত হত। আজকের মানুষ রাজনৈতিক নেতাকেই ভাবে অবতার, কাজেই নরপিশাচ শ্রেণীর নেতাকেও তারা মালা পরাতে কুণ্ঠিত হয় না। আগের মানুষ বাপ-মাকেই ভাবত দেবতা, আজকের মানুষ দলকেই ভাবে বাপ-মা। আগের মানুষ ভালো কি আজকের মানুষ ভালো সে কথা হচ্ছে না; সামাজিক মানব-চরিত্রের যেটা গড়, সেটা বোধ হয় সবযুগেই কমবেশী সমান থাকে। কিন্তু এরকম তুলনায় কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যে, 'ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' প্রভৃতি ভালো-ভালো আদর্শের দিক দিয়ে বর্তমান ভারতের বিন্দুমাত্র শ্রেষ্ঠতাও নেই ? আগের যুগকে যদি বলি 'যাজকী' মানুষের যুগ তবে আজকের যুগ হচ্ছে কাগজী মানুষের যুগ, দলীয় মানুষের যুগ, 'বাজারে' মানুষের যুগ।—ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক দিয়ে এই দু-যুগের মধ্যে বাছাবাছি করবার কী আছে ?

কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই সমাজধারানাশী ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ শুধু যে বড় নয়, তাই নয়—এ যুগ সে যুগের চেয়ে অনেকখানি ছোট। ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক দিয়ে এ-যুগ সে-যুগের সমান, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এ-যুগ অনেকখানি নিম্নস্তরের। এইমাত্র আমি সামাজিক মানব-চরিত্রের গড়ের কথা বলছিলাম। আগের যুগে সেই গড় হয়তো উঁচু ছিল না, কিন্তু সে যুগে তার অনুচ্চতা আজকের মতো অনিবার্য ছিল না। প্রাচীন সমাজে

বিদ্যাসাগরের মতো একজন তেজী ব্রাহ্মণ সব সময়েই বলতে পারতেন : সামাজিক মানবচরিত্রের গড় নেমে যাচ্ছে—জীবনযাত্রার সর্বজনীন গতিপথের দিকে তাকিয়ে তোমরা এর প্রতিবিধান কর।" তিনি বলতে পারতেন, "এই লোকটা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা করছে বটে কিন্তু আসলে ও বহুবিবাহপরায়ণ লম্পট।" তিনি বলতে পারতেন "ঐ মেয়েটা বহু সন্তানের জন্ম দিয়েছে বটে কিন্তু ও মায়ের কর্তব্য করেনি"। তিনি বলতে পারতেন : "এই লোকটা বৈধব্যব্রত নিয়ে বড বড কথা বলে বটে কিন্তু পদস্খলিত বিধবার বিয়ে না দিয়ে তার গর্ভপাত করাতেও ওর কুণ্ঠা নেই।" যাঁরা বিদ্যাসাগরের জীবনকথা ভালোভাবে জানেন, তাঁরা জানেন, বিদ্যাসাগর এই প্রণালীতেই সমাজের ভালো করতে চেয়েছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়তা, মায়ের কর্তব্য, ভ্রূণহত্যার পাপ, প্রভৃতি সর্বজনস্বীকৃত আদর্শকে উল্লঙ্ঘন করতে চাননি, বরং ওগুলোর উপর জোর দিয়েই সমাজধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকের ভারত কী চায়? **কাগজী মানুষের যুগে সদসৎ বিচারের কোনো স্থায়ী মাপকাঠি থাকতে পারে না**। যারা সামাজিক জীবনযাত্রার সর্বজনীন গতিপথটাকেই মানে না, তাদের কাছে বিধবাবিবাহও যা, ভ্রূণহত্যাও তাই। বিদ্যাসাগর ভ্রূণহত্যা নিবারণের জন্যই বিধবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আজকের ভারত ভ্রূণহত্যা করেও 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' করাতে চায়! এমন সমাজধারানাশিতার শেষ কোথায়? এই সদসদ্-বুদ্ধিহীন বাজারে মনের গন্তব্যস্থল কোথায়?

আধুনিক সমাজের ক্রীড্—নাস্তিকতা

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি সমাজধারাকে নষ্ট করার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু আধুনিক সমাজের ক্রীডের এটা আধখানা মাত্র। বাকি আধখানা হচ্ছে নাস্তিকতা বা ধর্মহীন মানবতাবাদ (humanism)। আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণীর ভিতরে যে দুটো দল আছে, তাদের মধ্যে কমিউনিস্টরা নিজেদের পাকারকম নাস্তিক বলেই ঘোষণা করেন। সেকিউলারিস্টরা বলেন,

ধর্ম বা আস্তিকতা যদি থাকে তো থাক, কিন্তু সেটা যেন ব্যক্তিগত জীবনেই আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ ধর্ম যেন কখনো Organised Religion বা সামাজিক ধর্ম না হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে আমি পাকারকম নাস্তিকতার কথাটাই আলোচনা করব।

এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দাঁড়িয়ে একথা বলা একেবারেই বাহুল্য যে 'নাস্তিক' কথাটা কোনো গালাগাল নয়। আস্তিকের মধ্যে ভণ্ড বা বদমায়েস থাকতে পারে, পেশাদার 'গুরু' থাকতে পারে, ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার পাণ্ডা থাকতে পারে এবং আরো নানা রকম বাজে লোক থাকতে পারে। পক্ষান্তরে নাস্তিকের মধ্যেও সৎলোক থাকতে পারে, পরোপকারী থাকতে পারে, কেবল বাক্যগত সাম্যবাদী নয়, কার্যগত সাম্যবাদী থাকতে পারে এবং আরো নানা গুণে গুণান্বিত লোক থাকতে পারে। ওরকম আদর্শ নাস্তিকতার দোষ ধরা যায় না, এবং ঠিক সেই কারণেই আদর্শ আস্তিকতাকেও খাটো করা যায় না। আদর্শের তুলনা করে সৎ সিদ্ধান্তে পৌছনো ভারী শক্ত, কিন্তু আস্তিক 'সমাজের' সঙ্গে নাস্তিক 'সমাজে'র তুলনা খুবই সম্ভবপর। আমি এখানে সে দিকটাই আলোচনা করব; সঙ্গে কেবল এইটুকু যোগ করব যে, ভগবান আছেন কি নেই, এ তর্ক অর্থহীন। আস্তিকের আস্তিক্যবাদও বিশ্বাসের ব্যাপার, নাস্তিকের জড়বাদ বা মানবধর্মবাদও বিশ্বাসের ব্যাপার।

আস্তিক্যবাদবিশ্বাসী আস্তিক সমাজ যে জড়বাদবিশ্বাসী নাস্তিক সমাজের চেয়ে ভাল তার সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, প্রথমোক্ত সমাজ স্বার্থের জীবনের বাইরে আরেকটা জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তার জন্য ব্যবস্থাও রাখে, শেষোক্ত সমাজ তেমন জীবনের অস্তিত্বও স্বীকার করে না, তার জন্য ব্যবস্থাও রাখে না। আমি একথা বলছি না যে নাস্তিকরা সবাই স্বার্থপর। কিন্তু নাস্তিকের নিঃস্বার্থতাও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অতিক্রম করা মাত্র,—মানবিক স্বার্থের বাইরে যাওয়া নয়। পক্ষান্তরে পারিবারিক ধর্মজীবন বলুন, বানপ্রস্থ বলুন, সন্ন্যাসজীবন বলুন—এগুলো সবই মানবিক স্বার্থের অতিরিক্ত এবং এ জিনিসগুলো কোনো

নাস্তিক সমাজে থাকতে পারে না। যে উৎসবের উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থ পুণ্যচিত্তের মিলন সে উৎসব শুধু আস্তিক সমাজেই আছে, নাস্তিক সমাজে নেই। যে আচার-ব্যবহারের উদ্দেশ্য সাংসারিকতার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা, সেটা শুধু আস্তিক সমাজেই মেলে, নাস্তিক সমাজে মেলে না। যে অবকাশের উদ্দেশ্য কোনো একটা স্বার্থাতিরিক্ত সত্তার স্মরণ চিন্তন, সে অবকাশ কেবল আস্তিক সমাজেই প্রাপ্য, নাস্তিক সমাজে প্রাপ্য নয়। এগুলো যে সমাজে নেই, তার শূন্যতা তার রিক্ততার কথা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

এই রিক্ততা নাস্তিক সমাজের শতকরা নব্বই জন লোকের জীবনেই প্রকট।—অত্যল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব যে, নাস্তিক সমাজে বাস করেও তারা একটা সর্বাঙ্গসম্পন্ন, বড় জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। বাকি যারা,—অর্থাৎ সংখ্যায় যারা একশোর মধ্যে নব্বই কিম্বা তার চেয়েও বেশি, —নাস্তিক সমাজে তাদের দিন কাটাতে হয় চাকরি করে এবং চাকরির ফাঁকে-ফাঁকে তাস খেলে, ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, মাছ ধরে বা দলবাজি করে। শতকরা দশজনকে আমি এ হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছি, তার কারণ নাস্তিক সমাজেও কতকগুলি অসামান্য লোকের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব; এই অসামান্য লোকেরা নাস্তিক সমাজে থেকেও চাকরির ফাঁকে-ফাঁকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে, পরোপকার করে, শক্ত শক্ত তত্ত্ব কথার আলোচনা করে, জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে। কিন্তু বাকি নব্বই জনের জীবনকে নাস্তিক সমাজ একেবারে দেউলিয়া করে দেয়। ধর্মজীবনের কোনো পরম সার্থকতা আছে কিনা আমি সে তর্কে যাচ্ছি না। আমি এমন কথাও বলছি না যে, ভগবানের নামসঙ্কীর্তন করে যে আমোদ পাওয়া যায় আমোদ হিসাবে সেটা তাস খেলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমোদের উপলব্ধিটা ব্যক্তিগত, সেখানে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের তর্ক অচল। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতো বেশ্যাসক্ত লোককেও নামকীর্তনের দ্বারা মনের দিক দিয়ে উন্নত হতে দেখা গেছে।—আজ পর্যন্ত কোনো তাস-খেলোয়াড় সম্বন্ধে এমন কথা শোনা যায়নি। বিল্বমঙ্গল আস্তিক সমাজের শতকরা নব্বই জনের

একজন। নাস্তিক সমাজের শতকরা নব্বই জনের মধ্যে এমন লোকের অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

আমি একটা কাল্পনিক অবস্থার কথা ভেবে বিলাপ করছি না। আমাদের এই কলকাতা শহরকে আজ নাস্তিকের শহর বললেই হয়। কিন্তু এই নাস্তিকতার ফল কী? মেয়েরা এখানে সিনেমা দেখে, শাড়ি-গয়নার তদারক করে, পরচর্চা করে অবসর কাটায়। পুরুষরা কাটায় তাস খেলে, খতম-কর-নিপাত-যাক-ওয়ালা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে,—সম্ভব হলে সপ্তাহান্তে (সচরাচর পরের পয়সায়) পেট পুরে মদ খেয়ে। শহরের সবচেয়ে শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর দশাই এই। পারিবারিক ধর্মজীবনকে দেশছাড়া করে শহরময় আজ যে বারোয়ারি পূজার চলন হয়েছে সেও আজকের বাঙালী জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার আরেকটা দিক। এর মধ্যে পারিবারিক মিলনোৎসবের চাঞ্চল্য নেই, ধর্মভাবের শালীনতা নেই, সামাজিকতার দরিদ্র-বাৎসল্য নেই। শহরের সবচেয়ে নাস্তিক-ভাবাপন্ন যুবকরাই এই দেবতার পাণ্ডা এবং এই দেবতাহীন দেবোৎসবের জাঁকজমক ও প্রমত্ততা আজকের বাঙালীজীবনের একটা বিভীষিকা। জীবনের এতখানি শূন্যতা বোধ হয় আমাদের চরম দুর্গতির দিনেও প্রকট হয়নি। এই সেদিন পর্যন্ত, আমাদের যারা চাষাভুষো, তারাও বারোমাসে তেরোপার্বণ করে, অতিথিসৎকার করে, সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করে, পুরাণ-কথকতা শুনে, পাঁচজনে মিলে মহোৎসব লাগিয়ে, পর্বদিনে একটা-বা মেলা বসিয়ে, সর্বাঙ্গসম্পন্ন জীবনযাপনের চেষ্টা করত। তাদের জীবনে ছিল ম্যালেরিয়া, ছিল মড়ক, ছিল দুর্ভিক্ষ, ছিল কুসংস্কার। কিন্তু এত মন্দের মধ্যেও সর্বাঙ্গসম্পন্ন জীবনযাপনের যে চেষ্টাটুকু তাদের মধ্যে ছিল—তার সঙ্গে এই তাসখেলার জীবনের, এই খতম-কর-নিপাত-যাক-ওয়ালা শোভাযাত্রার জীবনের এবং সপ্তাহান্তে পেট পুরে মদ খাওয়ার জীবনের তুলনা করতে লজ্জা বোধ হয়।

আধুনিক সমাজের ক্রৌড়—ব্যক্তিগত আস্তিকতা

আরেকটা কথা। "নাস্তিক সমাজ আস্তিক সমাজের তুলনায় নিকৃষ্ট ও হেয়" —যে একথাটুকু মানবে তার পক্ষে এও না মেনে উপায় নেই যে, আস্তিকতা সম্বন্ধে সেকিউলারিস্টদের মতটাও ভ্রান্ত। সেকিউলারিস্টরা কমিউনিস্টদের মতো পাকা নাস্তিক নন ; তাঁরা বলেন Organised Religion বা সামাজিক ধর্মটাই নিন্দনীয়, কিন্তু কেউ যদি ব্যক্তিগত জীবনে আস্তিক থাকতে চায়, তবে দোষ নেই"। এঁরা বোঝেন না যে, সমাজটাই যদি নাস্তিক হয় তো নাস্তিক সমাজের যে হীনতা ও রিক্ততার কথা এতক্ষণ আলোচনা করেছি সেটাকে 'ব্যক্তিগত আস্তিকতা' দিয়ে ঠেকানো যাবে না। এঁরা বোঝেন না, সামাজিক অভিব্যক্তিহীন যে আস্তিকতা সে আস্তিকতা থাকা না থাকা সমান কথা।

ধর্মের এই সামাজিক অভিব্যক্তির একটা সহজ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। মনে করুন আতিথ্যধর্ম—হিন্দুর ধর্মে এর জয়গান করা হয়েছে। হিন্দুর ধর্ম ছাড়া আর কোথাও এটা ধর্মের অংশ বলে কীর্তিত কিনা জানি না, কিন্তু প্রত্যেকটি সভ্য-সমাজেই আতিথেয়তার মর্যাদা স্বীকার করা হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, আতিথেয়তার মর্যাদাকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে স্থাপন করবার জন্যেই হিন্দুরা একে ধর্মের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন ; অর্থাৎ ধর্মকে তাঁরা একটা সমাজিক প্রথায় অভিব্যক্ত করেই সার্থকতা দিতে চেয়েছিলেন। রাম অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে পূজা করবে আর শ্যাম অতিথি দেখলেই সদরে খিল লাগিয়ে দেবে—আতিথ্যের এইরকম ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার চলন থাকলে তার দ্বারা কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কেবল আতিথ্যধর্ম নয়, দাতাকর্ণের দানধর্ম বলুন, সীতার সতীধর্ম বলুন, বিদ্যাসাগরের মাতৃপিতৃভক্তির ধর্ম বলুন—প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই একথা খাটে। কর্ণ বা সীতা বা বিদ্যাসাগর এক-একটা সামাজিক ধর্মের মহিমান্বিত প্রতিনিধি—এইটেই তাঁদের গৌরব। সামাজিক অভিব্যক্তিহীন যে ধর্ম, তার দ্বারা এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না।

এখানেও আমি একটা কাল্পনিক অবস্থার কথা ভেবে বিলাপ করছি না।

সেকিউলারিস্টরা যে 'ব্যক্তিগত আস্তিকতা'র কথা বলেন, আজকের নাগরিক ভারত কার্যত তারই অনুসরণ করে—কাজেই গোটা নাগরিক ভারতকেই আজ নাস্তিক বললে খুব বেশি ভুল হয় না। ধর্মের সামাজিক অভিব্যক্তির মধ্যে দুটো জিনিস বড়—এক পরিবার, দুই সামাজিক প্রথা। নাগরিক ভারতে পারিবারিক ধর্ম আজ লোপ পেয়েছে ; ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুপরিবারে বাপ-মাকে কেউ আজকাল 'প্রত্যক্ষ দেবতা'রূপে ভক্তি করে না। কোনো স্ত্রীলোকই স্বামীকে ভক্তি করে না, কোনো স্বামীই স্ত্রীকে সহধর্মিণী (ধর্মজীবনের সহায়) মনে করে না। সামাজিক দানধর্ম আজ আর নেই, শিক্ষিত শ্রেণীতে অতিথিশালা আর মন্দিরস্থাপন আজ হাসির ব্যাপার বলে গণ্য। ব্রহ্মচর্যকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, সতীত্বকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, সন্ন্যাসকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। অথচ প্রত্যেকেই আশা করে, সংবিধান-স্বীকৃত একটা কাগজী 'ফ্রীডম অব্ কনশেন্সের' জোরেই দেশে ধর্মের স্বার্থ বজায় থাকবে। এটা একেবারে পাগলের মতো কথা, কিন্তু আধুনিক জগতে এবং আধুনিক ভারতে অনেক জ্ঞানী লোককে এইরকম ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়।

অবনতির স্বরূপ

এই হচ্ছে 'আধুনিক সমাজের ক্রীড্'-এর পরিণাম। এ পর্যন্ত আমি একটা কথার উপরেই জোর দিয়েছি : আধুনিক ভারতে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতন হয়েছে এবং তার কারণ হচ্ছে এই ক্রীড্। নাগরিক ভারত আজ 'কাগজী মানুষ' ও 'দলীয় মানুষের' লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠছে ; অত্যন্ত নিম্নস্তরের সাংসারিক স্বার্থসর্বস্ব মানুষের ভিড়ে কলিকাতা-বোম্বাই-দিল্লী প্রভৃতি নব্যভারতের তীর্থস্থানগুলি আবিল হয়ে উঠছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের এই অবনতি বা নৈতিক অবনতি আমাদের দুর্গতির একদিক মাত্র। জ্ঞানবিজ্ঞান-সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের অবনতি হয়েছে —তার দায়িত্বও আধুনিক সমাজের ক্রীডের।

জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের নৈতিক অবস্থার নিশ্চয়ই কোনো সম্বন্ধ আছে—

কিন্তু সেই সম্বন্ধটা চট করে ধরা যায় না। রেনেসাঁসের যুগে ইতালীর মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় বড় বড় কাজের সূচনা করেছিল—কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও কি তারা উন্নত ছিল? সে-যুগের ইতালীর মানুষ ছিল পরস্ত্রীলোলুপ; তারা কথায় কথায় খুন করত; যে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরা ছিলেন সে-যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারকবাহক, তাঁদের নৈতিক শৈথিল্যের সীমা ছিল না। কিন্তু ইতালীতে তখন একটা জিনিস ছিল—স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাকে তারা সমাদর করত—'কাগজী' ও 'দলীয়' মানুষের উৎপাতে ইতালী ভারাক্রান্ত হয়নি*। তখনকার ইতালীর সঙ্গে আজকের চীন-রাশিয়ার তুলনা করলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চীন-রাশিয়া আজকের দিনের সবচেয়ে বেশি 'দলীয়' মনোবৃত্তির দেশ। এই দুটি একদলীয় দেশ ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই তারা আজ পর্যন্ত মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রাখতে পারেনি। 'দলীয়তা'র দিক দিয়ে নাগরিক ভারতের সঙ্গে ঐ দুই দেশের তফাত আছে: ওরা একদলীয়, আমরা বহুদলীয়। কিন্তু এটুকু তফাত সত্ত্বেও 'কাগজী' ও 'দলীয়' মানুষের প্রাধান্য এই তিন দেশে প্রায় একই রকম ফল সৃষ্টি করছে: ভারতে আজ জ্ঞানবিজ্ঞানের যে রিক্ততা এসেছে তার পরিণাম চিন্তা করলে ভয় হয়। সাহিত্যে বলুন, বিজ্ঞানে বলুন, শিল্পে বলুন, ভারত ভালো অনুকরণও করতে পারছে না। কেন এরকমটা হয়েছে তা নিয়ে কোনো শেষ কথা বলতে চাই না; কিন্তু এমন সন্দেহ অনিবার্য যে, এর সঙ্গেও আধুনিক সমাজের ক্রীড়ের একটা সম্পর্ক আছে। আমি বারবার বলেছি, সমাজধারানাশী দেশ তার চিন্তাশক্তিটুকু খবরের কাগজ, সিনেমা আর দলের হাতে বন্ধক দিয়ে বসে থাকে, কাজেই জ্ঞানবিজ্ঞানের অবনতি সে দেশে অনিবার্য। যে-দেশে 'সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন', 'সর্বাত্মক বিপ্লব' প্রভৃতি বুলি যত

---

* মনে রাখতে হবে মুদ্রাযন্ত্রের তখন সবেমাত্র আবিষ্কার হয়েছে—হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরা অনেকদিন পর্যন্ত হাতে-লেখা পুঁথির নকল করেই কাজ চালাচ্ছেন।

চড়াস্বরে বাজে সে-দেশ তত বেশি গতানুগতিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদেরও ঠিক তাই হয়েছে।

উপসংহার

যে আধুনিক সমাজ গড়বার জন্য আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত শ্রেণী আজ এত চঞ্চল হয়েছেন, তার অনেক ভালো ভালো উপাদান আছে। সোস্থালিজ্‌ম্ আছে, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' আছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, সাম্য আছে, বিজ্ঞান আছে, যন্ত্রশিল্প আছে,—কোন্ ভালো জিনিসটাই বা নেই? কিন্তু এগুলির সঙ্গে সঙ্গে আছে সমাজধারানাশিতা, নাস্তিকতা এবং ব্যক্তিগত আস্তিকতা;—আর আছে এই তিনের আনুষঙ্গিক যা কিছু আবর্জনা বা দুষ্কৃত: কাগজী ও দলীয় মানুষের উৎপাত; অতিমাত্রায় হীনবুদ্ধি সাংসারিক মানুষের আধিক্য; জীবনযাত্রার সর্বজনীন গতিপথহীন, মূল্যবোধহীন, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মিছিল; জ্ঞানবিজ্ঞানে মৌলিক চিন্তার একান্ত অভাব; এবং টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র। এগুলি ঐ তিনেরই আনুষঙ্গিক, তিনেরই পরিণাম। ঐ তিনকে বাদ দিয়ে, প্রাচীন সমাজধারাকে বজায় রেখে এবং আস্তিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে, আধুনিক সমাজের ভালো উপাদানগুলি আয়ত্ত করা যায় কিনা, তা কেউ তলিয়ে দেখেননি। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিতসমাজ তাঁদের পশ্চিমদেশীয় গুরুর পোষমানা তোতাপাখী মাত্র। ভালো উপাদানগুলিকে কী করে ঐ দুষ্কৃতজনক তিনের সংস্পর্শ থেকে উদ্ধার করা যায়, তেমন উপায় উদ্‌ভাবন করা তাঁদের সাধ্য নয়—কেননা তাঁদের গুরুরাও সে-বিষয়ে আজ পর্যন্ত পথ দেখাতে পারেননি। তবে পশ্চিম দেশে অন্ততঃ এটুকু বোধ আছে যে, বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ড-আমেরিকা বা চীন-রাশিয়া বিধাতার সর্বোত্তম সৃষ্টি নয়। মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দীর হীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যভূমিতে নিদারুণ ক্ষোভ আছে। আমাদের দেশে তাও নেই। আধুনিক সমাজের ক্রীড্ সম্বন্ধে আমাদের

শিক্ষিত শ্রেণীতে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, কোনো অনিশ্চয়ের ভাব নেই,—এ দৃশ্য দেখলে স্তব্ধ হতে হয়।

সে যাই হোক আর একটিমাত্র কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করব। 'আধুনিক সমাজের ক্রীড্'-এর সমালোচনা মানে প্রাচীন সমাজের গুণকীর্তন নয়। আমাদের প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন সমাজের বহুবিধ দোষত্রুটির কথা গত প্রায় দেড়শো বছর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টান মিশনারি,—ইদানীংকালে কমিউনিস্ট আর সেকিউলারিস্টদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব সমালোচনার কোনোটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এতক্ষণ আমি এ জিনিসটাই বোঝাতে চেয়েছি যে, প্রাচীন সমাজের সমালোচকেরা যে 'আধুনিক' সমাজের পরিকল্পনা দিয়েছেন সেটাও সমান কিংবা ততোধিক আপত্তিকর। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ধর্ম ও প্রাচীন সমাজের সারভাগটুকুর উপরেই আজ জোর দেওয়া উচিত*। যে ভাগটুকু অসার বা মন্দ তার বিরুদ্ধে আলাদা করে বিষোদ্গার আজ অনাবশ্যক, কেননা সেগুলির শিক্ষাগত বা রাষ্ট্রগত 'রিফর্ম' আজকের রাজনীতি বা সমাজনীতির মূল কথা। 'আধুনিক সমাজের ক্রীড্' ঐ বিষোদ্গারেরই নামান্তর—তার দ্বারা কোনো কল্যাণ হতে পারে না। আজ আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য: ঐ সারভাগটুকুর দিকে দৃষ্টি রেখে 'সাম্য', 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিসের অনুশীলন করা। ভারতে উচ্চস্তরের সমাজ গড়ার এইটেই রাস্তা। একে 'আধুনিক সমাজ'ই বলুন আর 'পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন সমাজ'ই বলুন, উন্নয়ন বা কল্যাণের একমাত্র পন্থা এইটিই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

* আমি হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্তটাই বিশদ করেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য, মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

মানবধর্মবাদ ও ধর্ম

(Humanism and Religion)

ধর্ম ছাড়া কি কোন সমাজ চলতে পারে? একালের শিক্ষিতসমাজের সাধারণ মত হচ্ছে: পারে,—তবে তার জন্য একটা 'অনুকল্প' চাই—একটা নূতন কিছু চাই। একালের শিক্ষিত সমাজের মতে সেই নূতন কিছু হচ্ছে হিউম্যানিজ্‌ম্‌—বাঙলায় এই শব্দকে 'মানবধর্মবাদ' নাম দিয়ে অনুবাদ করা যায়। আমি অন্যত্র* দেখিয়েছি, ভারতের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে আজ নাস্তিকতা আর সমাজধারানাশিতার ভাবটাই প্রবল। কিন্তু অনেকে আপত্তি করে বলতে পারেন: এই দুটি নঞর্থক বা নেতিবাচক মতের উপর জোর দিলে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর সদর্থক মতগুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। তাঁরা এই মানবধর্মবাদের দিকে সগর্বে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে পারেন। এটা যে সদর্থক মতবাদ তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

মানবধর্মবাদের মূল কথা হচ্ছে: যে-সব আদর্শ, যে-সব নীতি ও যে-সব অনুষ্ঠানপ্রণালীর যোগে একটা সার্থক জীবন যাপন করা যায়, জীবনের একটা সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলি সবই বিচারবুদ্ধিসম্মত এবং প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা-সম্মত হওয়া চাই। অর্থাৎ কোনো ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যে আদর্শ, যে নীতি ও যে অনুষ্ঠানপ্রণালী তৈরি হয়—যা দিয়ে সমাজ চলে—তার জায়গায় চাই এমন আদর্শ, এমন নীতি এবং এমন অনুষ্ঠান-প্রণালী যা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাক্ষ্যকেই প্রামাণিক বলে জানবে। এক কথায় মানবধর্মবাদের আদর্শ, নীতি ও অনুষ্ঠানপ্রণালী হবে নাস্তিক্যমূলক, কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ (empirical evidence) ও অনুমানের (inferential evidence) অতীত।

---

* আগের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১) মানবপ্রেম ও মানবসেবা এই মতের চরম আদর্শ ; (২) আপনার সুখ যাতে পরের সুখের বাধা না হয়—এইটেই এর নৈতিক বিচারের মাপকাঠি ; (৩) ধর্মহীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি এর অনুষ্ঠানপ্রণালী। বর্তমান কালে এই মতবাদ যে দুটি আকারে প্রচারিত হচ্ছে সেগুলিকে যথাক্রমে 'লিবারেল হিউম্যানিজ্‌ম্‌' এবং 'কমিউনিস্ট হিউম্যানিজ্‌ম্‌' নাম দেওয়া যায়। এই দুটির মধ্যে যেটুকু প্রভেদ আছে তার কথা এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু উপরে যে-সব কথা বলা হল সেগুলি এই দুই মতবাদের পক্ষেই সাধারণ। এই সাধারণ মানবধর্মবাদই আমাদের আলোচ্য।*

মানবধর্মবাদের আদর্শ

অনেকেই বোঝেন না, মানবধর্মবাদ আজো মত হিসাবে কত অসম্পূর্ণ বা অপরিণত। এর নামে, পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে, ধর্মের বিরুদ্ধে বিস্তর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে বলুন, নীতির ক্ষেত্রে বলুন, অনুষ্ঠানপ্রণালীর ক্ষেত্রে বলুন, মানবধর্মবাদ আজো প্রতি মুহূর্তে ধর্মের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। আদর্শের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মানবধর্মবাদ আজ পর্যন্ত মানবপ্রেম ও মানবসেবার কোনো ধর্মনিরপেক্ষ প্রয়োগপদ্ধতি খুঁজে পায়নি—এর প্রেরণায় কোনো বিশ্বব্যাপী মানবসেবাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ মানবধর্মবাদের প্রেরণা এমন নয় যে, মানুষকে তা জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবা করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করতে পারে। U. N. O. যে-সব সেবাপ্রতিষ্ঠান চালায় সেগুলিও এ-কথার ব্যতিক্রম নয়। বেতনভোগী কর্মচারীরাই ইউ. এন. ও-র সেবাকার্য পরিচালনা করে—রাজকর্মচারীদের সেই মাইনে-করা কাজে লেশমাত্র মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের

* কমিউনিস্টরা 'মানবপ্রেম', 'মানবসেবা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন না। সম্ভবতঃ 'বৈপ্লবিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব' বা ঐরকম কোনা শব্দ ব্যবহার করলেই তাঁদের আদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু এ প্রভেদ গুরুতর মনে করি না।

স্পর্শ থাকে না। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘ কিংবা খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ধর্মগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও সেব্য-সেবকের মধ্যে যেটুকু একত্ব বা সমানুভূতির বোধ জাগিয়ে দিতে পারে আজ পর্যন্ত কোনো মানবধর্মবাদী প্রতিষ্ঠান তা পারেনি।

অনেকে বলতে পারেন, "মানুষের ভালোর জন্যে সেবার প্রয়োজন আছে"—এ ধারণা সম্মানজনক নয়। তাঁরা আরো বলতে পারেন, মানবধর্মবাদ এই অসম্মানকর ধারণার বদলে একটা উৎকৃষ্টতর ধারণার পত্তন করেছে। মানবধর্মবাদ সেবার কথা, অন্ততঃ ব্যক্তিগত সেবার কথা, বলে না—বলে অধিকারের কথা। মানবধর্মবাদ বলে: "সব লোকেরই কতকগুলি মানবিক অধিকার আছে, সেগুলি রাষ্ট্রের দ্বারাই পূরণ হতে পারে, তার জন্যে কোনো সেবাপ্রতিষ্ঠানের দরকার নেই, রাষ্ট্রকেই একটা প্রকাণ্ড সেবাপ্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা সম্ভব"। মানবধর্মবাদের এই দাবি খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে "ওয়েলফেয়ার স্টেট" বা "প্রজামাত্রের দুর্গতিমোচনকারী রাষ্ট্রের" ধারণা মানবধর্মবাদেরই দান— "সোস্যালিস্ট স্টেটের" ধারণাও তাই। একথাও স্বীকার করতে হবে, ইউরোপ আমেরিকা ও রাশিয়ায় এ দুটি ধারণা প্রায় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অন্নহীনের অন্নপ্রাপ্তি এবং রুগ্‌ণের সেবাপ্রাপ্তি ঐ সমস্ত দেশে নিরন্ন ও ব্যাধিগ্রস্তদের অধিকারের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এসব অধিকার যারা পূরণ করে মানবধর্মবাদের সেই প্রতিনিধিদের সম্বন্ধেই সংশয়ের কারণ আছে। আমরা জানি রাষ্ট্র কিছুই পূরণ করে না রাষ্ট্র একটা বিমূর্ত আইডিয়া মাত্র। যারা পূরণ করে সেই রাজকর্মচারীদের মৈত্রী-করুণা নিয়েই সংশয়। একথা কারো অজানা নয়, যে-ব্যক্তি ধর্মের প্রেরণায় কোনো সেবাকার্যে এগিয়ে আসে তার বাক্যে বা কর্মে মানবতার যে সুর লাগে, কোনো রাজকর্মচারীর কর্মে ও বাক্যে সে সুর লাগে না, লাগতে পারেও না। আমি এমন বলছি না যে, ধর্মমূলক ও অবৈতনিক সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেবকমাত্রেরই বাক্যে ও কর্মে সেই সুর লাগে। কিন্তু তার কারণ, যথার্থ স্বেচ্ছাসেবক সংসারে অল্পই—অবৈতনিক ও ধর্মমূলক সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেবার

প্রেরণাও সচারাচর অন্নদায়। কিন্তু যারা শুধু ধর্মের প্রেরণাতেই সেবায় নিযুক্ত হয় আমি তাদের কথাই বলছি। যে মিশনারি সেব্যকে ভগবানের সন্তানরূপে দেখে কিংবা যে সন্ন্যাসী সেব্যের মধ্যে 'হৃদিস্থিত হৃষীকেশে'র দর্শন পায়, মানবধর্মবাদ তার মতো মৈত্রী, তার মতো করুণা সঞ্চার করতে পারে না। তার কারণ, মানুষকে তার দেহমনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মরসত্তারূপে দেখাই মানবধর্মবাদের রীতি—প্রত্যক্ষবাদী মতবাদে তার বেশি দেখা বারণ।

অনেকে এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর বলে উড়িয়ে দিতে পারেন! তাঁরা বলতে পারেন: 'ওয়েলফেয়ার স্টেটে'র মানবধর্মবাদী ধারণার দ্বারা আধুনিক জগতের সমৃদ্ধ দেশগুলিতে সাধারণ প্রজার জন্য যে সুখসম্পদের ব্যবস্থা হয়েছে, আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মের মৈত্রী, করুণা ও সেবার দ্বারা তার একশো ভাগের এক ভাগ সুখও উৎপন্ন হয়নি। ধর্মরাজ্য বলুন, রামরাজ্য বলুন, City of God বলুন,—যেখানে-যেখানে এগুলি অল্প পরিমাণেও সার্থকতা লাভ করেছে, আজকালকার ওয়েলফেয়ার ও সোশ্যালিস্ট স্টেটের তুলনায় অত্যল্পপরিমাণ মানবকল্যাণও সেখানে সাধিত হয় নি'। কিন্তু ধর্মপক্ষীয়েরাও এ যুক্তির একটা পাল্টা জবাব দিতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন: সেই সমৃদ্ধ দেশগুলি তো কই অন্যদেশের প্রজাকুলকে ঐ সুখ-সম্পদের ভাগ দেবার জন্য লেশমাত্র ব্যস্ততা দেখাচ্ছে না। 'ওয়েলফেয়ার' বা 'সোশ্যালিস্ট' স্টেটগুলিতেও তো কই মানবতার উত্তাপ তাদের সীমান্তভূমির গণ্ডী ছাপিয়ে উঠছে না।—মানবধর্মবাদের এই যে রাষ্ট্রিক সঙ্কীর্ণতার দিক, এটাকে অকিঞ্চিৎকর বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। আমরা ভারতবাসীরা পাশ্চাত্ত্যের মানবধর্মবাদী দেশগুলির* কাছ থেকে মানবতার দাবিতে সাহায্য প্রার্থনা করতে গিয়ে যে অসম্মান পেয়েছি সে ইতিহাস কারোই অজানা নয়। আজ পর্যন্ত

* আমি ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি পাশ্চাত্ত্য দেশকেই মানবধর্মবাদী বলছি। একথা ঠিক, এগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়াই কাগজে-কলমে মানবধর্মবাদী। কিন্তু অপর দেশগুলিতেও মানবধর্মবাদের প্রভাব আজ খ্রীষ্টধর্মের চেয়ে বেশি।

কোনো 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'ই আমাদের অমানুষিক দুর্গতিমোচনের জন্য গলদশ্রু হয়ে ছুটে আসেনি। স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরে আমাদের একটু-একটু করে ধারণা জন্মেছে যে, অন্ততঃ মানবতার দোহাই দিয়ে আমরা কোনো ধনী রাষ্ট্রের দ্বারা সেবিত হবার আশা করতে পারি না—বড় জোর একটু-আধটু মুষ্টিভিক্ষা পেতে পারি। একথা মানতেই হবে, আমাদের রাষ্ট্রও বারবার ভিক্ষুক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। সেটা লজ্জার কথা, কিন্তু যারা মানবধর্মবাদ নিয়ে বড়াই করে, তাদের মুখ থেকে India and her begging bowl-ঘটিত তিরস্কারের প্রাচুর্য লেশমাত্র মানবতার পরিচয় বহন করে না। কাজেই, আর কেউ না বুঝুক, অন্ততঃ ভারতবাসীর বোঝা উচিত মানবধর্মবাদের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে স্বদেশের সীমায় আবদ্ধ, ধর্মের সার্বভৌমিকতা তাতে নেই।

এই সার্বভৌমিকতার অভাব কেন? মানবধর্মবাদের কোন্ ত্রুটি থেকে এর উৎপত্তি? আমি আগেই বলেছি, মানবধর্মবাদের চরম আদর্শ মানব-প্রেম ও মানবসেবা। ধর্ম যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতীত এক অতীন্দ্রিয় সত্তাকে আশ্রয় করে এবং ধার্মিক লোকের প্রেম ও সেবা যেহেতু সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার নৈকট্য লাভের উপায় মাত্র, সেইজন্য তেমন আদর্শে মানবধর্মবাদের সায় নেই। এইখানেই মানবধর্মবাদের গোড়ায় গলদ। মানবপ্রেম ও মানবসেবা বলতেও মানবধর্মবাদ একটা বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ বুঝিয়ে থাকে—মানুষের অন্নজল জোগানো ও শিক্ষাদানই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু যে আদর্শ মানুষকে তার 'হৃদিস্থিত হৃষীকেশ'রূপে দেখে না, দেহমনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মরসত্তারূপেই দেখে, তার মধ্যে খুব বেশি বিস্তার থাকতে পারে না। এইজন্যই মানবধর্মবাদের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ—তত্ত্বের দিক দিয়ে সে যতই সার্বভৌমিক হোক—কার্যক্ষেত্রে প্রতিপদেই রাষ্ট্রিক সঙ্কীর্ণতার পাথরে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত ও সঙ্কুচিত হতে থাকে। কথা উঠতে পারে, বুদ্ধও তো মানুষকে মরসত্তারূপেই দেখেছিলেন অথচ তাঁর ধর্মে তো মৈত্রী-করুণার আদর্শে এমন একটা বিপুলতা দেখা যায় যা আর কোনো ধর্মে নেই। এ-কথার উত্তর: বুদ্ধ এই মরসত্তাকে যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার সঙ্গে মানবধর্মবাদের দৃষ্টির

তুলনা চলে না। "হে ভিক্ষুগণ! সবই দহ্যমান। চক্ষু দহ্যমান, রূপ দহ্যমান, চক্ষুসংস্পর্শজনিত যে সুখদুঃখ সেও দহ্যমান। কিসে দহ্যমান? আমি বলি। রাগাগ্নিতে দহ্যমান, দ্বেষাগ্নিতে দহ্যমান, মোহাগ্নিতে দহ্যমান; জন্মে, জরায়, মৃত্যুতে, শোকে, পরিদেবনে, উপায়াসে দহ্যমান"।* —মানবধর্মবাদ এই দাহের কথা স্বীকার করে না, বুদ্ধবর্ণিত 'নির্বেদ' বা বৈরাগ্যের বাণীতেও সায় দেয় না। বস্তুতঃ বুদ্ধের যে লোকাতীত করুণা সে এক মহা বৈরাগ্যের পরিণাম। মানবধর্মবাদ এই দুটিকেই বিচারবুদ্ধির অগম্য বলে অগ্রাহ্য করে। মানবধর্মবাদ বলতে পারে: লোকাতীত করুণায় ক্ষুধার্ত মানুষের অন্নজলের প্রয়োজন মেটে না, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের দারিদ্র্য ঘোচে না, এবং মুক্তিলিপ্সু মানুষের মন যদি বা ভেজে, ভুখারি মানুষের চিঁড়েটুকু ভেজে না। কিন্তু আগেই বলেছি, মানবধর্মবাদের এই চিঁড়ে-ভেজানো মানবসেবাও 'ওয়েলফেয়ার স্টেটে'র রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করতে পারে না—ধর্ম সেটা পারে।

মানবধর্মবাদের নীতি

এ-কথা কেবল আদর্শের সম্বন্ধে নয়, মানবধর্মবাদের নীতির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সেক্ষেত্রেও দেখা যায় মানবধর্মবাদের নীতি বড়ই সীমাবদ্ধ, যদিও সেই সীমা সর্বত্র রাষ্ট্রিক সীমা নয়। মানুষের পরস্পরসম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে মানবধর্মবাদ যে-সমস্ত নীতির আভাস দেয় সেগুলি অযথার্থ বা অসম্পূর্ণ, তার কারণ মানুষকে কেবলমাত্র মরসত্তারূপে দেখেই ঐ সব নীতি নির্মিত হয়, মানুষের মধ্যে অমানুষী সত্তার আভাস পেয়ে হয় না। আমরা জানি, রাষ্ট্রিক, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু মৈত্রী-করুণা, প্রেম-প্রীতি থাকে তাই দিয়েই মানুষের জীবনে কতকটা পূর্ণতা আসে। আমি এমন বলতে চাই না যে, সেই পূর্ণতার অনুশীলন করতে গিয়ে সব লোকই পরস্পরকে অমর সত্তারূপে দেখবার সাধনা

* বুদ্ধের Fire Sermon বা অগ্নিসূত্ত।

করে। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা করে তারা যে একে অন্যকে একেকটা মরসত্তারূপেই দেখে, একথা বলাও সুযুক্তি নয়। বাস্তবিক পক্ষে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যেটুকু মৈত্রী-করুণার অনুশীলন হয়, বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই সেটা বিচারবুদ্ধি দিয়ে মাপজোখ করে আসে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সংসর্গলিপ্সা আছে তারই প্রেরণায় এ জিনিসটা বিনা বিচারে অজ্ঞাতসারে এবং অচেতনভাবে সম্পন্ন হয়। যারা এ ব্যাপারে সচেতনভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে, তারা হয় সীনিক,* নয় কবি, নয় ধর্মজিজ্ঞাসু। 'সীনিকে'র কথা এখানে বিচার্য নয় —মানবধর্মবাদকেও 'সীনিকে'র দর্শন বলা যায় না। কিন্তু কবি ও ধর্মজিজ্ঞাসু যদি মৈত্র ও করুণ হয়, তাহলে, যারা তাদের মৈত্রী ও করুণার লক্ষ্য তাদের সত্তায় তারা সচেতনভাবেই একটা সীমাহীনতা আরোপ করে। কাব্যকার এই সীমাহীনতাকে গোড়ার কথা বলে স্বীকার করে এবং এটাকে সৃষ্টির পরমতম রহস্য ভেবে বন্দনা করে। ধর্ম এই সীমাহীনতাকে ঐশ্বরিক সীমাহীনতার একটা পার্থিব প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করে এবং পার্থিব মৈত্রী-করুণাকে সে এক অপার্থিব অনুভবের অপরিস্ফুট ও অর্ধব্যক্ত ইঙ্গিত বলে জানে। একথা মানতেই হবে, কাব্যরসিক ও ধর্মজিজ্ঞাসু দুজনেই এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মানবধর্মবাদই কি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে মানুষের পরস্পর-সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘষে একটা সন্তোষজনক ধারায় চালনা করতে পেরেছে? পারেনি যে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর-সম্বন্ধ নিয়ে আধুনিক জীবনের জটিলতা। মানবধর্মবাদ স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার যতই বাড়াক, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দৈহিক আকর্ষণের বেশি আর কোনো সম্বন্ধসূত্র সে দেখতে পায় না। এই সম্বন্ধকে সে যে মানবধর্মবাদী নীতি দিয়ে চালনা করতে চায় তার মূল হচ্ছে কাম। দৈহিক সম্বন্ধ যে অতিক্রম করে যেতে হবে, এটাকে সে বড় জোর একটা বিশেষ বয়সের

* Cynic

নীতি বলে মানতে পারে—যে বয়সে ইন্দ্রিয়ের জোর কমে আসে সেই বয়সের নীতি বলে সম্মান করতে পারে। সে-বয়সের আগে—একদিকে আত্মসুখের খাতিরে আত্মসংযমের নীতি, আরেকদিকে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সুখ-অসুখকে সম্মান করার নীতিই তার কাছে চূড়ান্ত। "দাম্পত্যজীবন ধর্মজীবনের অংশমাত্র" একথা তার কাছে অবোধ্য বা অগম্য। কোনো নীতিই আদ্যন্ত নির্দোষ নয়—আমিও স্ত্রীপুরুষের ধর্মসম্বন্ধের নীতিকে অপব্যবহারের সম্ভাবনামুক্ত বল্‌তে চাই না। পরস্পরের ধর্মজীবনের সহয়তা করা, পুরুষের পক্ষে একপত্নীত্ব পালন করা, স্ত্রীর পক্ষে সতীত্বের সাধনা করা—এই সমস্ত নীতি যে অনেক দম্পতির জীবনেই সার্থকতা পায়নি সেটা কে না জানে? স্ত্রীপুরুষ দুই পক্ষই যে এই সমস্ত নীতির অনুশীলনে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে সে-কথা কে অস্বীকার করবে? এর নামে স্ত্রীলোকের মানবিক অধিকারও বারবার ক্ষুণ্ণ হয়েছে—মানবধর্মবাদীদের এই যুক্তিটাও অখণ্ডনীয়। এই অধিকারবৃদ্ধি সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে না, কিন্তু অল্পসংখ্যক দম্পতির জীবনেও ধর্ম যে সার্থকতা দিত, মানবধর্মবাদ কি তা দেয়? আর কিছু না হোক, এই মানবধর্মবাদী যুগের কাব্যসাহিত্য পড়লেই বোঝা যায়, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ থেকে মানবমহিমার শেষ বিন্দুটুকুও আজ অন্তর্ধান করেছে এবং ভোজ্যপাত্রের তলায় যে ভুক্তাবশেষটুকু পড়ে আছে সেটাকে অপরিতৃপ্ত লালসার এক প্রকাণ্ড ভস্মস্তূপ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অথচ এও আমরা জানি, স্ত্রী-পুরুষের ধর্মসম্বন্ধের যুগেও কাব্য সচরাচর দৈহিক আকর্ষণের সৌন্দর্যকেই প্রতিফলিত করতে চাইত—ধর্মসম্বন্ধের নিগূঢ় বিশিষ্টতা তার বিবেচ্য বিষয় ছিল না। তবু সেই ধর্মবিরল কাব্যজগৎ থেকেও মানবমহিমার স্বর্ণমূর্তি যদি আজ নির্বাসিত হয়ে থাকে, তবে এই মানবধর্মবাদী যুগের বস্তুতান্ত্রিক জীবনের দৈনন্দিন দুনিয়াদারিতে ভরা দাম্পত্য সম্বন্ধের ছেঁড়াকাঁথায়, একটা বিকটকঙ্কালময় প্রেতাত্মা ছাড়া আর কে রাজত্ব করবে?—স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে বাগ্‌বাহুল্যের দরকার নেই, কিন্তু এসব কথা সবরকম প্রেমপ্রীতিমূলক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানবধর্মবাদের দ্বারা প্রত্যেকটি মানবসম্পর্কের ভূমিকাই আজ সঙ্কুচিত ও মলিন হয়েছে বলে মনে করি।

প্রত্যক্ষের মধ্যেই প্রত্যক্ষাতীতের অধিষ্ঠান,—এমনধারা বিশ্বাস না থাকলে মানবসম্পর্কের জমিতে ভদ্রতা আর সভ্যতার চেয়ে দামী ফুলের চাষ সম্ভব নয়।

মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী

মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী সম্বন্ধেও সংশয়ের কারণ আছে। এই অনুষ্ঠানপ্রণালীর নাম 'শিক্ষা'। এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মশিক্ষা নয়, 'কালচার' বা 'সংস্কৃতিই' এর লক্ষ্য। বাস্তবিক পক্ষে Humanism কথাটার আদি অর্থ কোনো 'আদর্শ' বা 'নীতি' নয়—এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রণালী মাত্র। যতদূর জানা যায়, ইতালীর রেনেসাঁসেই এই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব—এবং সে-যুগে Humanism বলতে বোঝাত কতকগুলি বিদ্যা, যা রোমান চার্চের থিওলজি-আশ্রিত বিদ্যার সঙ্গে বৈসাদৃশ্যবশতঃ ঐ নামে নামাঙ্কিত হয়।* এই হিউম্যানিটিজ্ বিদ্যা আজো ইউরোপীয় লোকের স্বোপার্জিত কালচারের মূল বলে গণ্য, আমাদের দেশেও হিন্দুকলেজের যুগ থেকে এই শিক্ষাই প্রচলিত হয়ে এসেছে। একেবারে আধুনিক কালে বিজ্ঞানশাস্ত্র এই বিদ্যার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র বিজ্ঞান শিখিয়ে মানুষকে কী করে 'কালচার' দেওয়া যায়, সে-কথা আজ পর্যন্ত কেউ বোঝাতে পারেনি। যতদূর বোঝা যায়: পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানশিক্ষা আজ হিউম্যানিটিজ্-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে—কেউ কাউকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। মানবধর্মবাদের সঙ্গে এগুলির যোগ এই যে, এই দুরকম শিক্ষাই ধর্মহীন, যদিও অনিবার্যভাবে ধর্মবিদ্বেষী নয়।

এই ধর্মহীন শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। এটুকু বললেই চলবে যে, মানবধর্মবাদের 'আদর্শ' ও 'নীতি' যে-অর্থে অসম্পূর্ণ সে-অর্থে তার অনুষ্ঠানপ্রণালীও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। ইউরোপে এইজন্য

---

* থিওলজি—ঐশ্বরিক বিদ্যা, হিউম্যানিটিজ্—মানবিক বিদ্যা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মানবধর্মবাদী শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষাও দেওয়া হত—ক্রীশ্চান 'আদর্শ' ও ক্রীশ্চান 'নীতি' তখনও পরিত্যক্ত হয়নি। এই বিংশ শতাব্দীতেই দেখা যায় ইউরোপের মানবধর্মবাদী শিক্ষা একান্তভাবে মানবধর্মবাদী আদর্শ এবং মানবধর্মবাদী নীতির উপরে জোর দিতে চায়। কিন্তু এখানে আমি এ দিকটার আলোচনা না করে মানবধর্মবাদী শিক্ষার এক বিশেষ ত্রুটির কথা বলব। ইতালীর রেনেসাঁসের ঐতিহাসিক Jacob Burckhardt এই ত্রুটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে :

"[হিউম্যানিস্টিক বিদ্যাচর্চার বিরুদ্ধে] সবচেয়ে যে গুরুতর নালিশ করা যায় সেটা এই : ঐ বিদ্যাচর্চা জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের একটা প্রভেদ জন্মিয়ে দেয় এবং এরই প্রভাবে ইউরোপ প্রথম শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুই শ্রেণীতে অতিবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় এ নালিশ অযৌক্তিক। তার কারণ নালিশটার সত্যতা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বোঝার পরে, একালেও, আমরা এর সংশোধনের কোনো পথ দেখতে পাই না।"

বুর্খার্টের এই মন্তব্যের গুরুত্ব খুবই বেশি। এ-সব কথা তিনি কিঞ্চিদধিক একশো বছর আগে লিখেছিলেন, কিন্তু একশো বছরে তাঁর কথার সত্যতা আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে। ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষিতসমাজ আজ অশিক্ষিতসমাজ থেকে এত বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যে, সর্বসাধারণের জন্য একালে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও হীনস্তরের "কালচার" সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বলে "ম্যাস কালচার" (Mass Culture)। অবশ্য ইউরোপ-আমেরিকার অশিক্ষিতসমাজ আমাদের দেশের অশিক্ষিতসমাজের মতো নিরক্ষর নয়। কিন্তু সে-দেশেও একটি কারখানার মজুর সচরাচর টি. এস. এলিয়টের কাব্য বা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দার্শনিক বিচার পড়ে না। হলিউডি ধাঁচের সিনেমা, জেম্‌স্ বণ্ড্ প্রভৃতির সাহিত্য এবং কামোত্তেজনাময় টেলিভিশন শো—এই সমস্তই পাশ্চাত্ত্যের সাধারণভোগ্য কালচারের পণ্য। আমাদের দেশে mass culture শব্দটার সুষ্ঠু প্রয়োগ সহজ নয়। পশ্চিম বাঙলার কথা বলতে পারি—আজকালকার বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সিনেমার শতকরা

নব্বই ভাগই এই শব্দের এলাকাভুক্ত। এ-দেশে 'ম্যাস কালচার' আর 'কালচার'-এ কোনো প্রভেদ নেই।

সে যাই হোক, 'কালচার' যেসব দেশে প্রভূতপরিমাণে বিদ্যমান, সেই পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলিতে আজ শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে মারাত্মক প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে প্রভেদ এসেছে মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী থেকে। সম্ভবতঃ চীন-রাশিয়াও এ-কথার ব্যতিক্রম নয়, যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম কথা শুনলে বিস্মিত হবেন। আমরা জানি, রাশিয়ায় 'সোশ্যালিস্ট স্টেটে'র পত্তন হবার পর ইউরোপ-আমেরিকায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ঘোচাবার একটা প্রবল উদ্যম করা হয়েছে। সে উদ্যমে ইউরোপ-আমেরিকাতেও 'ওয়েলফেয়ার স্টেটে'র পত্তন হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, বৈষম্য কমানোর দিকেই 'সোশ্যালিস্ট' ও 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'গুলির একান্ত প্রচেষ্টা। কিন্তু আমরা মনে রাখি না, সে বৈষম্য ধনের বৈষম্য মাত্র—'কালচারে'র বৈষম্য পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক বেড়ে গেছে। রাশিয়ার খবর আমরা অল্পই জানি—কিন্তু সে-দেশেও একজন 'এ্যাকাডেমিশিয়ানের' সঙ্গে একজন ঝাড়ুদারের যতই সামাজিক মর্যাদাঘটিত সাম্য থাক, 'কালচারের' সাম্য না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এই নূতন বৈষম্যের মূল হচ্ছে মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী অর্থাৎ ধর্মশিক্ষাবর্জিত একান্ত 'হিউম্যানিস্টিক' বা একান্ত 'বৈজ্ঞানিক' শিক্ষা। আমার বক্তব্য: ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রণালীতে এ বৈষম্য ছিল না।

বুর্খার্ট এ-কথার সপক্ষেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে: রেনেসাঁসের যুগেই "প্রথম" এই বিচ্ছিন্নতা দেখা দিল। এ-কথার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, পূর্বযুগের চার্চের শিক্ষাপ্রণালীতে এই বৈষম্য ছিল না। বুর্খার্টের ইঙ্গিত এখানে সম্প্রসারিত করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির দিকে একটু চোখ ফেরালে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না।

আমাদের ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রণালীর যুগে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের এই বৈষম্য ছিল না। হিন্দুদ্বেষী ও ব্রাহ্মণদ্বেষী লেখকদের কল্যাণে আমরা এই শিখেছি

যে, ব্রাহ্মণরা নাকি একটা যাজকসমাজ, তারা গরিব লোকের ঘাড় মটকিয়ে রক্তপান করত এবং শূদ্রের শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যেকটি উপায় বন্ধ করবার চেষ্টাতেই দিবারাত্র আত্মনিয়োগ করত। কিন্তু হিন্দুর ইতিহাসে যাঁর অক্ষর-পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, এমন যে মনুমহারাজের শূদ্রদ্বেষী শাস্ত্র, তাতেও ব্রাহ্মণ শ্রেণী একটা ভিক্ষুকসমাজরূপে কল্পিত হয়েছিল—ধর্মরক্ষকের প্রাপ্য ভক্তিমূলক মর্যাদা ছাড়া আর কোনো মর্যাদা তাদের প্রাপ্য ছিল না। একথা মানতেই হবে, তারা গ্রামের সমাজপতি ছিল। তারা লোকের জাত মারত এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু লোকশিক্ষকও তারাই ছিল। অব্রাহ্মণকে তারা বেদ না পড়াক, পুরাণ কাহিনী শোনাত ; বস্তুতঃ পুরাণের উৎপত্তিও ঐ সূত্রে। পণ্ডিতী তত্ত্বকথাকে অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় 'কালচার্ড' লোকের 'কালচার'কে (লোকগ্রাহ্য করবার জন্য) কিংবদন্তী ও ইতিহাসের আখ্যান যোগে পরিবেশন করাই পুরাণের উদ্দেশ্য। এই পুরাণকথকতা ১৯শ শতাব্দী থেকেই লোপ পেতে শুরু করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই লোকশিক্ষার উৎকর্ষ বোঝাতে গিয়ে লিখেছিলেন : "যে লাঙল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না, সেও শিখিত। শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড আছে, পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরম কার্য।" সম্ভবতঃ বঙ্কিম একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন, কেননা আমাদের লাঙল-চষা, তুলা-পেঁজা এবং কাটনা-কাটা জনসাধারণ যদি এতই শিখত তাহলে এদেশ স্বর্গে পরিণত হত। কিন্তু এই ধর্মমূলক লোকশিক্ষা যে এ-যুগের 'ম্যাস-কালচারে'র চেয়ে উন্নত ছিল, এ-কথা স্বীকার্য*। মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী থেকেই 'ম্যাস-কালচারে'র উৎপত্তি।

---

* অবশ্য তাতেও বিকৃতি ছিল। ১৯শ শতাব্দীর যাত্রা ও কবিগান সেই বিকৃতির দৃষ্টান্ত

মানবধর্মবাদ ও ধর্ম

এইজন্য মনে করি, মানবধর্মবাদ ও ধর্মের কলহ অনুচিত ও অকর্তব্য। যুগে যুগে মৈত্রী-করুণার বাণী প্রচার করে ধর্ম যে-কাজ করতে পারেনি, মানবধর্মবাদ অবলীলাক্রমে সে-কাজ সম্পাদন করেছে—'প্রজামাত্রের দুর্গতিমোচনকারী রাষ্ট্রে'র ধারণা সৃষ্টি করে ইউরোপ-আমেরিকা-চীন-রাশিয়ায় সে অভূতপূর্ব কীর্তিসৌধ নির্মাণ করেছে। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাষ্ট্রাতিরিক্ত মানবপ্রেম তার সাধ্যায়ত্ত নয়—সেটা আজ পর্যন্ত ধর্মেরই এলাকা। নীতির ক্ষেত্রে দেখা যায়—মানব-সম্বন্ধের চালনায় সভ্যতা-ভব্যতার চেয়ে বড় নীতি-নিয়ম তার আয়ত্ত নয়—সেও আজ পর্যন্ত ধর্মেরই এলাকা। অনুষ্ঠানপ্রণালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজের সর্বস্তরব্যাপ্ত সভ্যতা গড়া তার কাজ নয়—সেও আজ পর্যন্ত ধর্মের এলাকা। কাজেই মানবধর্মবাদ ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক রূপেই গণনীয়, পরস্পরের শত্রুরূপে নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানবধর্মবাদ সবদেশেই ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করে। ধর্মের সংশোধনের চেয়ে ধর্মবিদ্বেষের বাণী প্রচার করাকেই সে বড় কাজ বলে মানে। আধুনিক ভারতের মানবধর্মবাদ সম্বন্ধে এ-কথা বিশেষ ভাবে সত্য।

ভারতে মানবধর্মবাদ

ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায়, মানবধর্মবাদের আবির্ভাব স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে। প্রাক্‌স্বদেশী যুগের বাঙলায় সবচেয়ে শক্তিশালী ভাবধারা ছিল ধর্মজাগরণের ভাবধারা—তারি বশে সে-যুগে ব্রাহ্মসমাজের মতো সম্প্রদায় এবং একটি উদারপন্থী হিন্দু গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল।* স্বদেশী আন্দোলনের পরে দেখা

---

* প্রাক্‌স্বদেশী যুগের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে একদল কোঁৎশিষ্যের আবির্ভাব হয়েছিল—এঁরা Positivist, এবং Religion of Humanity-র উপাসক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে এই দলের প্রতিনিধি হিসাবে নেওয়া যায়। কিন্তু এঁরা সেকালের বাঙালী

গেল : ঐ ধর্মজাগরণের ভাবধারা রাজনীতির চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু বলতে হয়, স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত 'মানবধর্মবাদ' আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে কোনো শক্তিশালী রূপ ধারণ করেনি। বাস্তবিক পক্ষে এখনো তা করেছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু 'কমিউনিস্ট' আর 'সেকিউলারিস্ট'—এই যে দুটি শিরোনামায় আজকের ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসীদের দ্বিধাবিভক্ত করা যায়, তাঁরা উভয়েই মানবধর্মবাদের নামে ধর্মের, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের, বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অনেক সময়ে এই বিষের তীব্রতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

(১) এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, ভারতের রাষ্ট্র আজো মানবধর্মবাদী আকারে গড়ে ওঠেনি। কাগজে-কলমে আমাদের রাষ্ট্রও 'ওয়েলফেয়ার স্টেট', কিন্তু ভারতের অগণিত মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়তা এবং রোগব্যাধির নিবারণে এই স্টেটের অক্ষমতা আজ কারোই অজানা নয়। মানবপ্রেম ও মানবসেবার ধর্মাশ্রিত আদর্শের প্রয়োজন আমাদের মধ্যে আজো একতিল কমেনি—কেননা রাষ্ট্রের সমালোচনার কাজ ছাড়া আমাদের মানবধর্মবাদীদের দ্বারা আর কোনো কাজ আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। এদেশে অত্যন্ত ছোট আকারেও এমন কোনো বেসরকারী মানবসেবা-প্রতিষ্ঠান বা লোকশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি যার প্রেরণা মানবধর্মবাদ। কাজ যেটুকু হয়েছে—এবং কাজের চেয়ে বেশি, মানবসেবার যেটুকু বিবেকবুদ্ধি আমাদের মধ্যে দেখা গেছে, তার ষোলো আনাই আজো ধর্মবিশ্বাসীদের কীর্তি, এ সম্বন্ধে এক বিবেকানন্দের নাম করাই যথেষ্ট। ভারতে মানবসেবার বিবেকবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে এই অসামান্য সন্ন্যাসীর তীব্র-উদ্দীপনাময় বাণীসমষ্টিই আজো আমাদের একমাত্র অবলম্বন,—সে বাণী পড়লে আজো

জীবনে লেশমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় গ্রীক মানবধর্মবাদ ও ১৯শ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানবধর্মবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনিও মানবধর্মবাদী ছিলেন না, যদিও তাঁর ধর্মতত্ত্বের বিচারপ্রণালীকে—'হিউম্যানিস্টিক এ্যাপ্রোচ টু রিলিজিয়ান' নাম দিলে ভুল হয় না।

আমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট, সেকিউলারিস্ট প্রভৃতি মানবধর্মবাদীরা আজ উপহাস ও বিদ্রূপের দ্বারা এইরকম প্রেরণার ভিত্তিমূল ক্ষয় করতেই ব্যস্ত হয়েছেন—এ দৃশ্য দেখলে হতবুদ্ধি হতে হয়।

(২) মানবধর্মবাদীদের নীতি সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। 'নিজের সুখ যাতে পরের সুখে বাধা না হয়', এই মানবধর্মবাদী নীতি আজো আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়নি অথচ মানুষের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্বকল্পনার ধর্মমূলক নীতি আজকাল হাসাহাসির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এর ফল হয়েছে কী? ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে আজ যে পরিমাণ কলহ, ঈর্ষ্যা এবং পারস্পরিক পৃষ্ঠদংশনের অভ্যাস দেখা যায় এমন আর কোন্ দেশে আছে? আমি আগেই বলেছি, মানবধর্মবাদের প্রেরণায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায় ভদ্রতা, সভ্যতা প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর নীতি—কেননা পরের সুখে বাধা না হবার নীতি থেকে এর চেয়ে বড ফল জন্মাতে পারে না। কিন্তু এই ক্ষুদ্রতর নীতিগুলিই কি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মমূলক নীতির ভিত্তিমূল ক্ষয় করে আমরা কোন্ সার্থকতার পথে অগ্রসর হচ্ছি?

(৩) মানবধর্মবাদের অনুষ্ঠানপ্রণালী সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। আমি আগেই বলেছি, মানবধর্মবাদী শিক্ষায় ধর্মশিক্ষার সর্বজনীনতা নেই, তারই ফলে ইউরোপ-আমেরিকায় আজ 'কালচারে' আর 'ম্যাস কালচারে' একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে। এই 'ম্যাস কালচার' আমাদের দেশেও এসেছে, হলিউডি ধাঁচের সিনেমা, কামোত্তেজনার সাহিত্য এবং yellow journalism আমাদের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে আমাদের তফাত এই যে, মানবধর্মবাদী শিক্ষায় যেটুকু 'কালচার' আসে সেটুকুও আমাদের দেশে বদ্ধমূল হতে পারেনি। স্বাধীনতার পরে বিজ্ঞানশিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা নিয়ে যে-পরিমাণ বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তার দ্বারা আমাদের হিউম্যানিস্টিক শিক্ষার কলসটাতে একটা প্রকাণ্ড ছিদ্র খনন করা হয়েছে—আর কিছুই হয়নি। লোকশিক্ষায় পুরাণ-কথকতার ধারাটা আজ প্রায় একেবারে

নির্মূল হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে সেটুকুও গেছে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের পরিচালনাধীনে—দেশের সর্বোচ্চ-শিক্ষিতদের মনের সঙ্গে তার কোনো যোগ সেই। সিনেমা আমাদের দেশে পুরাণ-কথকতার স্থান অধিকার করে লোকশিক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় হতে পারত—কিন্তু মানবধর্মবাদীদের চলচ্চিত্র-সমালোচনার কল্যাণে ধর্মমূলক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রচারই ভারতীয় চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য সে আদর্শও কার্যগত রূপ পায়নি। কেননা পরীক্ষায় দেখা গেছে সিনেমার ব্যাবসায়িক সাফল্য আমাদের দেশে কামোত্তেজনা ও খুনোখুনির দৃশ্যের উপরেই পনের আনা নির্ভরশীল। কিন্তু একদিকে এইরকম তাত্ত্বিক আদর্শ, আরেক দিকে ঐরকম ব্যাবসায়িক সাফল্যের মানদণ্ড—এ দুটো জিনিসকে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় মানবধর্মবাদের ধর্মবিদ্বেষ আমাদের কোন্ পথে চালনা করছে।

এই হচ্ছে আমাদের দেশে মানবধর্মবাদের স্বরূপ। ইউরোপ-আমেরিকা বা চীন-রাশিয়ার ধর্মবিদ্বেষের সঙ্গে আমাদের ধর্মবিদ্বেষের তুলনা করে লাভ নেই। ঐ সমস্ত দেশের যাঁরা মানবধর্মবাদী তাঁরা অন্ততঃ কিছু কাজ সমাধা করেছেন। কিন্তু যারা কিছুই করেনি তারা যখন প্রচলিত ধর্মনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বাহবা কুড়োতে চায় তখন বড় বিস্ময় বোধ হয়। এই বিস্ময়োৎপাদনই আমাদের মানবধর্মবাদীদের—আমাদের কমিউনিস্ট ও সেকিউলারিস্টদের—একমাত্র কীর্তি, এবং এ কীর্তিটি তাঁরা ভালোভাবেই সমাধা করেছেন। তাঁরা যে ডালটি আশ্রয় করে জীবনধারণ করছেন, সেই ডালটিকেই মহা আড়ম্বরে ছেদন করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, পরিণামের দিকে ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

মুক্তি কোন্ পথে ?

আধুনিক ভারতের মুক্তি কোন্ পথে ?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনিবার্যভাবে ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীদের চিন্তাধারাকে স্মরণ করতে হয়। তার কারণ, ১৯শ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীরা এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা এ-যুগে সেটাকে অগ্রাহ্য করে একটা নূতনতর উত্তর খুঁজে পাবার জন্য কেবলই ব্যর্থ চেষ্টা করে মরছি। আধুনিক ভারতের মুক্তি ইউরোপীয় সভ্যতাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।—সেই ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মিলনের একটা সার্থক চেষ্টা করেছিলেন ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরা। জাপানের যে চেষ্টা একদিন সারা জগতে সাড়া জাগিয়েছিল এবং আরো সাম্প্রতিক কালে চীনের যে চেষ্টা সারা জগতের প্রশংসা ও উদ্‌বেগের কারণ হয়েছে—সে-যুগের বাঙালীদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব তার চেয়ে কম নয়। রাজনৈতিক ও অন্যবিধ দুর্বিপাকে বাঙালীর মানসিক শক্তি এ-যুগে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে ঐ চেষ্টার দিকে কারোই আর নজর পড়ছে না বটে, কিন্তু তার জন্য তার গৌরব কমতে পারে না।

১৯শ শতাব্দীতে বাঙালী-মন হঠাৎ জেগে উঠেছিল। ইংরেজিশিক্ষার সংস্পর্শেই জেগে উঠেছিল, এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষা কথাটা অত্যন্ত শিথিল ও অস্পষ্ট। ঐ শিক্ষার দ্বারা ট্যাঁশ ফিরিঙ্গিও সৃষ্টি হয়, আবার এমন মানুষেরও উদ্ভব হয়—প্রতিভার জ্যোতিতে ললাট যাদের জ্যোতির্ময়। আসল কথা, ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরা ইংরেজিচর্চা থেকে তিনটে খুব বড় শিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রথম ধর্ম-জিজ্ঞাসা,—মনসা-শীতলা ও জাতপাতের উপধর্মকে তাঁরা ধর্ম বলতে অস্বীকার করেছিলেন। দ্বিতীয় সমাজ-জিজ্ঞাসা,—আমাদের মধ্যযুগীয় সমাজ যে একেবারেই বদ্ধ ও জীবনীশক্তিহীন, ইংরেজের গতিশীল সমাজের সঙ্গে তুলনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তটা মেনে নিয়েছিলেন। তৃতীয় সভ্যতা-জিজ্ঞাসা,—উইলিয়ম জোন্স-এর সময় থেকে সংস্কৃতচর্চার যে নূতন ধারার সূচনা হয়, যে ধারার মূলকথা হচ্ছে মধ্যযুগীয় ভারতসভ্যতার তুলনায়

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বস্বীকার, সেই ধারাটাকে তারা শ্রদ্ধা করেছিলেন। এই তিনটি জিজ্ঞাসা থেকে তিনটি প্রধান ভাব সে-যুগের বাঙালী সমাজে বিশেষ প্রবলতা লাভ করে। (১) ধর্মের ক্ষেত্রে মোটামুটি এই ধারণাটাই স্বীকৃত হয় যে, আমাদের ধর্মের মূল স্মৃতিশাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র নয়; ধর্মের মূল হচ্ছে গীতা আর উপনিষদ, এবং স্মৃতি-পুরাণকে যতদূর পর্যন্ত গীতা-উপনিষদের ভাষ্যরূপে দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত স্মৃতি-পুরাণ। তখন থেকে নিষ্কাম কর্ম, সর্বভূতে প্রীতি এবং লোকসেবাই হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষারূপে স্বীকৃত হয়। (২) সভ্যতা-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে মোটামুটি ইউরোপীয় ভারত-তাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্তটাই গৃহীত হয়, কিন্তু বাঙালীরাই সে-যুগে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে একটা নূতন সভ্যতানির্মাণের সূত্র হিসাবে গ্রহণ করার সাহস দেখান;—সেটাকে বলা যায়, নূতন এক ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতা। সে-যুগের সাহিত্যে শিল্পকলায় স্বাদেশিকতায় এ জিনিসটাই প্রকাশ পায়। সাহিত্যে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কীর্তিকেও পুরোপুরি প্রাচ্য জিনিস বলা যায় না,—কিন্তু তাঁদের প্রতিভার গুণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণ সেদিন একটা মৌলিক সৃষ্টির গৌরব অর্জন করেছিল। চিত্রকলা সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য, স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত কিছুর পিছনে ছিল উইলিয়ম জোন্স থেকে আরম্ভ করে মাক্সমূলার পর্যন্ত, সংস্কৃতজ্ঞ ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত, সেই বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত—যার সারমর্ম হচ্ছে যে, হিন্দুরা এক আদি ও অভগ্ন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সন্তান—দাসত্বের জন্মগত ললাট-লিখন নিয়ে তারা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়নি। এরই অনুসিদ্ধান্তরূপে, ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরা ভেবেছিলেন, এ-যুগেও তারা ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ করতে পারে না, পারে শুধু তাদের স্বাধীন ইন্দো-ইউরোপীয় পরিচয়টা নূতন করে ঘোষণা করতে।

(৩) গোলযোগ দেখা দেয় সমাজ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে। এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে ভাবটা আমাদের মধ্যে প্রবল হয়েছে সেটা হচ্ছে সমাজধারা-নাশিতার ভাব। ভদ্রসমাজে মদ খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন, যন্ত্রযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণের

অভ্যাস এবং ভ্রূণহত্যা সম্বন্ধে বিবেকবুদ্ধির খর্বতা এর সবচেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত আজকের ভারতেই বেশি সুলভ হয়েছে বটে, কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতেই এর অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। ডিরোজিওর একজন শিষ্য সেদিন অত্যন্ত দাম্ভিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, হিন্দুসমাজের প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেদিন বাপ-মা সম্বন্ধে হিন্দুসমাজের যে বিবেকবুদ্ধি, তার উপর পদাঘাত করে সৎমায়ের বিধবাবিবাহ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। অনেকে মদ আর গোমাংস খেয়ে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কাজেই বলতে হয়, আজকের ভারতের সমাজধারানাশী ক্রিয়াকলাপের বীজ সে-যুগেই দেখা দেয়। কিন্তু সে-যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা যা চেয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাঁরা চেয়েছিলেন, সমাজের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজের সংস্কার করতে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগামিতা, দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজে'র তত্ত্ব—এগুলি সবই 'সমাজধারারক্ষার সহযোগী সমাজসংস্কারের' ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই ভাবধারার সবচেয়ে দার্শনিক বিবৃতি আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়। শাস্ত্র ও সমাজের যে অংশটুকু যুক্তি ও লোকহিতের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত সেইটুকু গ্রাহ্য, বাকিটুকু অগ্রাহ্য—বঙ্কিমবর্ণিত এই মতটাকেই আমরা সে-যুগের সমাজ-জিজ্ঞাসার সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ বলতে পারি। এর সঙ্গে ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও সভ্যতা-জিজ্ঞাসার সূত্র দুটি যোগ করলে সে-যুগের মানসিক ও নৈতিক জাগরণের সব কয়টি মূলসূত্র পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই তিনটি সূত্রই 'মুক্তি কোন্ পথে'-প্রশ্নের সে-যুগের উত্তর। এ উত্তর স্থায়ী হয়নি: স্বদেশীযুগে ও গান্ধীযুগে এ-উত্তর চাপা পড়ে যায়, তার কারণ ১৯০৫ সাল থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত ভারত রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া আর কোনো মুক্তির কথা ভাবেনি।

আজকের ভারতে যে দুর্দিন এসেছে তাতে নূতন করে প্রশ্ন উঠেছে—মুক্তি কোন্ পথে? ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীরা এ-প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তার প্রভাব

আজকের দিনে একেবারে লোপ পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজকের ভারত ইউরোপীয়-সভ্যতা অনুসরণের চীনজাপানী কায়দাটাই অনুকরণ করতে চায় —বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প দিয়েই সে দেশের মুক্তি আনতে চায়। ইংরেজিশিক্ষা আজ কারো মনেই ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সমাজ-জিজ্ঞাসা বা সভ্যতা-জিজ্ঞাসা জাগায় না— অথবা ততটুকুই জাগায় যতটুকু ইউরোপ-আমেরিকা বা চীন-রাশিয়ার সাম্প্রতিকতম চিন্তার বিমূঢ়তম প্রতিধ্বনি। স্বাধীনতার পর থেকে ধন-সম্পদের উৎপাদনবৃদ্ধি ও সঙ্গত বিলি-ব্যবস্থার প্রশ্নটাই শিক্ষিত ভারতকে ব্যাকুল করেছে,—আর কোনো দিকেই সে দৃকৃপাত করেনি। এই ব্যাকুলতার নিন্দা করা যায় না। জগতের প্রত্যেকটি বড় দেশই দারিদ্র্যের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পেরেছে,—ভারত একেবারেই পারেনি। কিন্তু আজকের সবচেয়ে তিক্তসত্য এই যে, এতখানি ব্যাকুলতাও সম্পূর্ণ বিফলে গেছে। ইউরোপীয় সভ্যতা-অনুসরণের চীনজাপানী কায়দায় শিক্ষানবিশী করতে গিয়ে স্বাধীন ভারত 'মুক্তি কোন্ পথে' প্রশ্নের সদুত্তর পায়নি।

আজকের ভারতে যে দুর্দিন এসেছে, তার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের যথেষ্ট মিল আছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর এ-দেশের চরম অধঃপতন হয়েছিল। সে-যুগে ধর্ম পরিণত হয়েছিল মনসা-শীতলা, বামাচার এবং ন্যাড়ানেড়ি-ঘটিত উপধর্মে; পারিবারিক জীবনে এসেছিল ব্যভিচার; সাহিত্যে এসেছিল কুরুচি আর লাম্পট্য—বিদ্যার নদী বদ্ধজলে পরিণত হয়েছিল। এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে আমরা আবার সেই একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিম বাঙলায় ধর্ম আজ বারোয়ারি পূজার নষ্টামিতে পরিণত হয়েছে; নাগরিক ভারতের প্রায় সর্বত্রই পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে; সাহিত্য আবার কুরুচি আর লাম্পট্যে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে; বিদ্যার নদী মজতে শুরু করেছে। দারিদ্র্য-সমস্যারও কোনো সমাধান আমরা পাইনি, বরং এ পর্যন্ত যে কাজটুকু সম্পন্ন হয়েছে ভাঙন বা ধ্বংসই তার প্রধান লক্ষণ: একদিকে আমাদের গ্রামজীবনের ধ্বংস, আরেকদিকে যন্ত্রযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্বহীন প্রচারের ফলে সামাজিক শ্লীলতার ধ্বংস···সাধারণভাবে পারিবারিক জীবনের ধ্বংস।

আজকের ভারতের মুক্তি কোন্ পথে?—চট করে এ-কথার জবাব দেওয়া যায় না। চীনজাপানী কায়দায় দেশকে বড় করে তোলার আশা আমাদের দেশে এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দারিদ্র্যসমস্যার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানচর্চা ও যন্ত্রশিল্প গড়ার চেষ্টা আমরা ছাড়তে পারি না। তা যদি না পারি তবে গ্রামজীবন-ধ্বংসের দ্বারা আমাদের সভ্যতার যে গ্লানি প্রকট হয়েছে, সে দামটুকু না দিয়ে বোধ হয় আমাদের উপায় নেই। অন্যদিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির যে প্রচণ্ড বেগ আধুনিক ভারতের একটা বড় লক্ষণ, কিছু দাম না দিয়ে তারো গতিরোধ অসম্ভব। কিন্তু ভয়ের কথা এই যে, অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে তাকিয়ে ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং সভ্যতা-জিজ্ঞাসাকে আমরা আজ জলাঞ্জলি দিতে বসেছি। শিক্ষিত ভারত আজ ভ্রূণহত্যার মতো মহাপাপকেও শান্তভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে, এবং দেশময় 'নিরোধে'র মহিমাকীর্তনে মনোনিবেশ করেছে, এ-দৃশ্য দেখলে স্তব্ধ হতে হয়।

আজকের ভারতের মুক্তি কোন্ পথে?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না। কিন্তু যাঁরা মনে করেন ইউরোপীয় সভ্যতা-অনুসরণের চীনজাপানী কায়দায়, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনকে সবচেয়ে বড় করে দেখলেই আমাদের উদ্ধার হবে, তাঁরা ভুল করেন। এ-কথা মানতেই হবে, ১৯শ শতাব্দীর বাঙলাদেশের সর্বত্র যে 'জাগরণের' মশাল জ্বালা হয়েছিল, আমাদের দারিদ্র্যসমস্যার উপরে তার আলো একেবারেই পড়েনি, অথবা অত্যন্ত ক্ষীণশিখায় পড়েছিল। কিন্তু ধর্মে ও সমাজে, চারিত্রে ও বিদ্যাচর্চায়, সাহিত্যে ও শিল্পে, কিছুকালের জন্য আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ যে একটা অপার্থিব আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য। সে দীপ্তি যে দারিদ্র্যসমস্যার সমাধানেও আবশ্যক হয়, আজকের ভারতের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। আজকের ভারতে প্রতিষ্ঠালোলুপ এবং স্বার্থান্বেষী মানুষের সংখ্যা অনেক,—স্বার্থের উত্তেজনা থেকে যে প্রচণ্ড কর্মশক্তি আসতে পারে, তারো পরিচয় আমরা নানা দিক থেকে পেয়ে থাকি। কিন্তু যে কর্মশক্তি যথার্থ দেশের কাজে আসে, তা

আজ একেবারেই দুর্লভ হয়েছে। আজকের ভারত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের মতো দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গোটা দেশটাকে যেন ভূতে পেয়েছে। এইজন্যই অর্ধপথে-পরিত্যক্ত বাঙলার জাগরণের মশালটা নূতন করে জ্বালিয়ে তোলার কথা আজো আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। ধর্ম-জিজ্ঞাসা, সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং সভ্যতা-জিজ্ঞাসার ধারাটা পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ধর্ম-জিজ্ঞাসা। আমরা শুনেছি, নিষ্কাম কর্ম, চিত্তশুদ্ধি এবং সর্বভূতে প্রীতিই আমাদের ধর্মের সারশিক্ষা। কিন্তু এ শিক্ষার কোনো প্রভাব যে আমাদের জীবনে আর নেই, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। দেশের সবচেয়ে মেধাবী যুবকদের আজ একমাত্র চেষ্টা হচ্ছে, কী করে বড় বড় চাকরি পাওয়া যায়; কী করে সুন্দর সুন্দর মেয়েদের করায়ত্ত করা যায়; কী করে নামযশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এ-সমস্তর সাধনা যে সবাই নীতিহীনভাবে করছে, এমন কথা বলতে চাই না। বরং মার্ক্সবাদ প্রভৃতির প্রভাবে একধরনের ধর্মবর্জিত নৈতিকতার কথা আজকাল খুব ঢাকঢোল বাজিয়েই প্রচার করা হয়। কিন্তু দেশের সবচেয়ে মেধাবী যুবকদের পূর্বোক্ত কার্যকলাপ দেখেই বোঝা যায়, 'ধর্মবর্জিত নৈতিকতা'র স্বরূপ কী? আমরা লক্ষ্য করছি না যে, নীতির পথ থেকে যে তিলমাত্রও বিচ্যুত হয়নি সেও সারাজীবন কামনা-পঙ্কিল কর্মে ব্যাপৃত থাকতে পারে; চিত্ত যার পরম অশুদ্ধ সেও সারাজীবন নীতিসম্মত ভোগের সাধনা করতে পারে; আত্মপ্রীতি যার জীবনের ধ্রুবতারা সেও সারাজীবন দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আজকের ভারতের সেরা মানুষদের জীবনই এই,—সাধারণ যারা, তাদের কথা না বললেও চলে। জীবনযাত্রার এই গ্লানি আজ দেশের প্রত্যেকটি শহরে ধাপে-ধাপে প্রকাশ পাচ্ছে। যে-দেশে ধর্ম-জিজ্ঞাসা নেই, সে-দেশে এরকমটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-স্বাভাবিক যে আসলে কতখানি অস্বাভাবিক, সে-কথা ভাবলে ধিক্কার দিতে হয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

হিউম্যানিজ্‌ম্‌ (Humanism) শব্দের অর্থ

এ বইএর নানাস্থানে আমি লিখেছি, ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ছিল না—'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এর প্রতিনিধিরা কেউ হিউম্যানিস্ট ছিলেন না। এর থেকে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। আজকালকার স্কুলের ছেলেরাও জানে, 'বাঙলার রেনেসাঁস' কথাটা 'ইতালীর রেনেসাঁস'-এর অনুকরণেই তৈরি হয়েছে, এবং ইতালীর রেনেসাঁস-এর পিছনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিল হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর। বাঙলার রেনেসাঁস-এ যদি হিউম্যানিজ্‌ম্‌ না থাকে তবে সেটা কেমনধারা রেনেসাঁস ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। যাঁরা বলেন 'বেঙ্গল রেনেসাঁস'-এ হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ছিল, তাঁরা হিউম্যানিজ্‌ম্‌ শব্দটা আধুনিক অর্থেই প্রয়োগ করে থাকেন। এই অর্থের হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ইতালির রেনেসাঁস-এও ছিল না, কাজেই এ যুক্তিতে বেঙ্গল রেনেসাঁসকে 'রেনেসাঁস' বলতে কোন বাধা নেই। 'হিউম্যানিজ্‌ম্‌' শব্দের আধুনিক অর্থ হচ্ছে 'মানবতাবাদ' বা 'মানবধর্মবাদ'। এ বইএ আমি যেখানে যেখানে বলেছি, ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ছিল না, সেখানে এই আধুনিক অর্থটাও লিখে দিয়েছি, কাজেই আমার বক্তব্য সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। তবে এও আমার বলা উচিত : যে আদি ও মৌলিক অর্থে ইতালির রেনেসাঁস-এর প্রেরণাকে হিউম্যানিজ্‌ম্‌ বলা হয়, সে অর্থের হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ১৯শ শতাব্দীর বাংলাদেশেও ছিল। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ বাঙালী লেখক সেই আদি অর্থটা জানেন না অথচ নিজেদের অজ্ঞতাটুকু স্বীকার না করে ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় আধুনিক অর্থঘটিত হিউম্যানিজ্‌ম্‌ ছিল বলে গোলযোগ করে থাকেন।

হিউম্যানিজ্‌ম্ শব্দের আদি অর্থ 'মানবতাবাদ' নয়,—কোনো 'বাদ' বা ইজ্‌ম্-এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নেই। শুধু যে সম্পর্ক নেই তা নয়, ইতালীর রেনেসাঁস-এর ইতিহাসলেখক J. A. Symonds দেখিয়েছেন, ঐ ইজ্‌ম্-ওয়ালা শব্দটা পর্যন্ত ইতালীতে ছিল না, পরের যুগের লেখকরাই এটাকে ইতালীর রেনেসাঁস-এর প্রেরণামূল বোঝাতে গিয়ে সৃষ্টি করেন। Symonds-এর মতে শব্দটা জার্মেনিক এবং এর আদি অর্থ হচ্ছে কতকগুলি বিদ্যার অনুশীলন মাত্র। ইতালীতে যারা থিওলজি বা 'ঐশ্বরিক বিদ্যা'র বদলে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি 'মানবিক বিদ্যা'র চর্চা করত তাদেরকে 'হিউম্যানিস্ট' বলত। অর্থাৎ 'হিউম্যানিস্ট' শব্দ আগে—'হিউম্যানিজ্‌ম্' শব্দের উৎপত্তি তার পরে। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন, এই আদি অর্থের হিউম্যানিজ্‌ম বা 'মানবিক বিদ্যার অনুশীলন' ক্রমে ক্রমে জার্মেনি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে,—ক্রমশঃ গোটা ইউরোপের বিদ্যাচর্চায় এই আদি অর্থের হিউম্যানিস্টদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই হিউম্যানিস্টরা অনেকেই পরমধার্মিক খ্রীস্টান ছিলেন, কেউ-বা ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন,—কিন্তু 'মানবধর্মবাদ' বা আধুনিক অর্থের হিউম্যানিজ্‌ম্-এর সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না, কেননা মধ্য ১৯শ শতাব্দীর আগে খ্রীস্টান ইউরোপে আধুনিক অর্থের Humanism-এর অস্তিত্বই ছিল না। ফ্রান্সের ওগুস্ত কোঁৎকেই প্রথম আধুনিক অর্থের হিউম্যানিস্ট বলা যায়।

আদি ও মৌলিক অর্থ-ঘটিত হিউম্যানিজ্‌ম্ ১৯শ শতাব্দীর বাংলাদেশেও ছিল। নীরদ চৌধুরী মহাশয় তাঁর আত্মজীবনীতে এই অর্থেই School of Bengali Humanism কথাটা ব্যবহার করেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে Bengali Humanism গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার 'মানবিক' বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। ১৯শ শতাব্দীর বাঙলায় যাঁরা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা করতেন তাঁদেরকেই বাঙালী হিউম্যানিস্ট বলা যায়। এই অর্থে মাইকেল হিউম্যানিস্ট, রাজেন্দ্রলাল মিত্র

হিউম্যানিস্ট, বঙ্কিম হিউম্যানিস্ট, রমেশ দত্ত হিউম্যানিস্ট। রমেশ দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মগ্রন্থের চর্চাতেও 'হিউম্যানিস্টিক' পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই আধুনিক অর্থে হিউম্যানিস্ট (=মানবধর্মবাদী) ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রকে আধুনিক অর্থে হিউম্যানিস্ট বলার যুক্তি সবচেয়ে বেশি, কেননা কোঁৎ-এর Religion of Humanity-র প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু কোঁৎ-এর নিরীশ্বরবাদকে তিনিও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কাজেই তাঁকেও আধুনিক অর্থে হিউম্যানিস্ট বলা সঙ্গত হবে না।

বিদ্যাসাগর কোনো অর্থেই 'হিউম্যানিস্ট' ছিলেন না। প্রথমতঃ তিনি মানবধর্মবাদী ছিলেন না, কাজেই তাঁকে আধুনিক অর্থে হিউম্যানিস্ট বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ধর্মশাস্ত্রচর্চাতেও তিনি মীমাংসাদর্শনের 'অমানবিক' পদ্ধতি মেনে চলতেন, কাজেই আদি অর্থের হিউম্যানিস্ট শব্দও তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। তবে 'শকুন্তলা' ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পাদনার সাক্ষ্যে তাঁকে আংশিক ভাবে আদি অর্থ-ঘটিত হিউম্যানিস্ট বললে কোনো মারাত্মক দোষ হয় না। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ* মহাশয় এই অর্থেই তাঁকে 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিত বলেছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এ অর্থ আংশিক ভাবেই খাটে। রামমোহনকে আংশিকভাবেও হিউম্যানিস্ট বলা যায় না—আদি অর্থেও না, আধুনিক অর্থেও না।

শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমাদের ইতিহাসচর্চাও কী পরিমাণ বিকৃত হয়েছে, আমি তার একটা দৃষ্টান্ত দেব। ইতিহাসের একজন নামজাদা অধ্যাপক ইংরেজি ও বাঙলায় 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং একটি চটি বই লিখেছেন। এগুলিতে তিনি নানাস্থানে ইঙ্গিত করেছেন: বেঙ্গল রেনেসাঁস-এ আধুনিক অর্থের হিউম্যানিজ্‌ম্ ছিল। অবশ্য এটা মস্তবড় ভুল কথা; কিন্তু এখানেই তিনি থামেননি। নীরদ চৌধুরীর 'আত্মজীবনীর' সমালোচনা

---

* ১৯শ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে যাঁর কৃতিত্ব ব্রজেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তুলনীয়—কোনো কোনো দিকে তাঁর চেয়েও বেশি।

করে তিনি নীরদবাবু কথিত Bengali Humanism নিয়ে একটু হাসাহাসি করেছেন। নীরদবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। 'রজনী'র নায়ক অমরনাথের 'হিউম্যানিস্টিক কালচার'-এর উল্লেখ করে লিখেছিলেন: জনপ্রিয় নবেলে ওরকম চরিত্রচিত্রণের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে সে যুগের বাঙলায় (আদি-অর্থঘটিত) হিউম্যানিজ্‌ম্-এর প্রেরণা খুবই প্রবল ছিল।—নীরদ বাবুর আত্মজীবনীর সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের অধ্যাপক জানিয়েছেন, ওরকম চরিত্রের কথা শুনলে তাঁর হাসি পায়। কার কিসে হাসি পায় তা নিয়ে দোষ ধরা চলে না। কিন্তু ইতিহাসের একজন নামজাদা অধ্যাপক যদি বলেন যে, যে হিউম্যানিজ্‌ম্ সে যুগের বাঙলায় ছিল না সেটা তাঁর মতে ছিল, এবং যে হিউম্যানিজ্‌ম্ ছিল সেটা তাঁর মতে হাসির ব্যাপার—তা হলে আমাদের মতো মূর্খেরা কী করবে? কান্না ছাড়া তাদের উপায় কী?

লেখকের পরবর্তী গ্রন্থ

ইতিহাস ও সাহিত্য